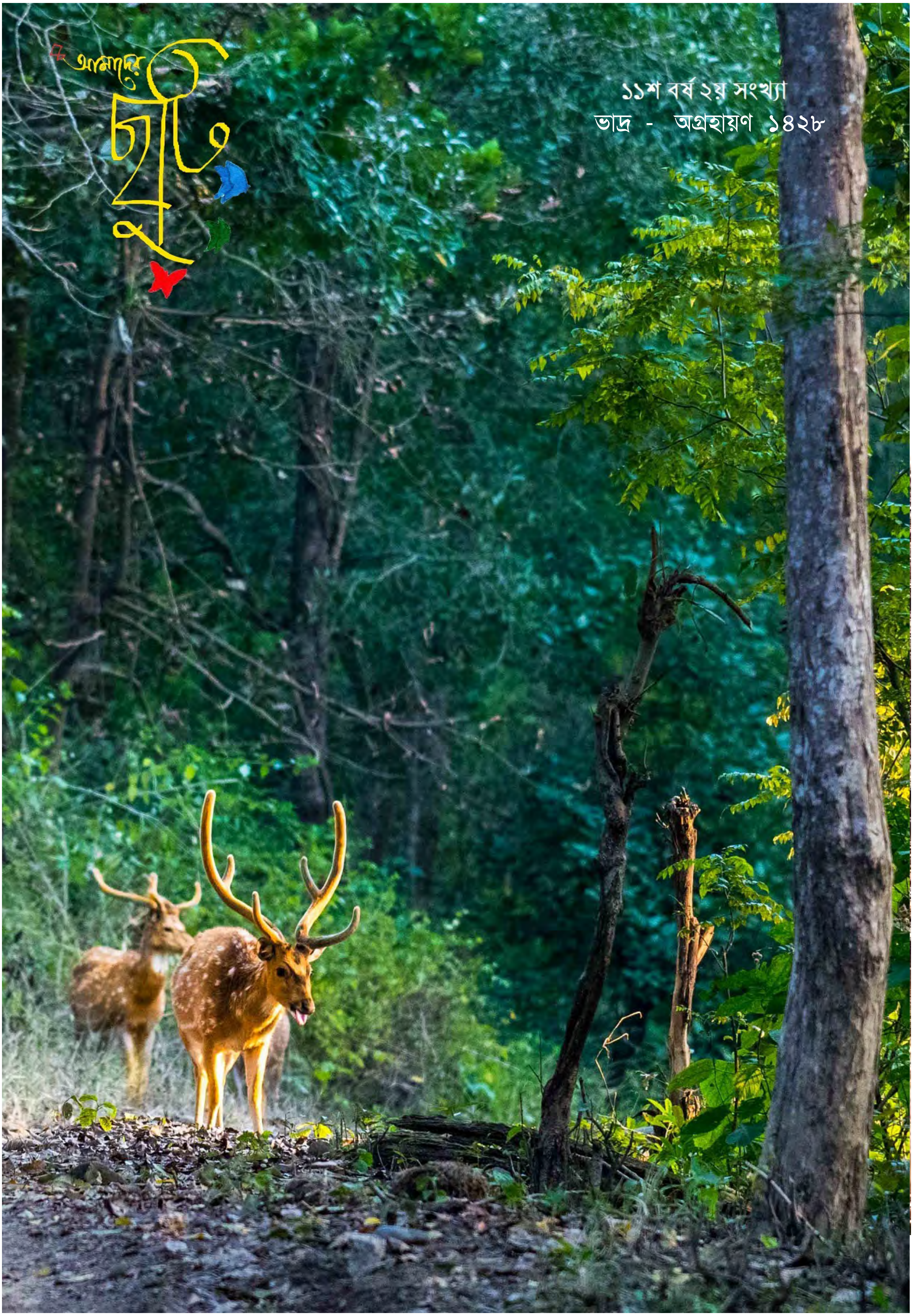

প্রকৃতির স্পট লাইট, করবেট ন্যাশনাল পার্ক - আলোকচিত্রী প্রমথেশ সাহা

আমাদের ছুটি ইচ্ছে হলেই...

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

১১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
ভাদ্র - অগ্রহায়ণ ১৪২৮

লকডাউন প্রায় উঠেই গেছে, অন্তত দেশের মধ্যে কোথাও দিনকয়েক কাটিয়ে আসা তো যায়ই এখন, ওমিক্রনের জুজু সত্ত্বেও। কিন্তু যাব যাব করে এখনও বেরিয়ে পড়তে পারিনি। তাই চলছে মানসভ্রমণই। সদ্য পড়ে শেষ করলাম অমিতাভ ঘোষের 'হাংরি টাইড'। হাতের কাছে হওয়া সত্ত্বেও আজও সুন্দরবনেই যাওয়া হয়নি। ভাটির দেশের গল্প পড়তে পড়তে যেন সত্যিই চলে যাই সেখানে। পিয়ালি রায়, আমেরিকার বাসিন্দা এক তরুণী সমুদ্র-জীববিজ্ঞানী সঙ্কটাপন্ন বিরল এক ডলফিন প্রজাতির খোঁজে এলেন সুন্দরবনে। সেখানে একের পর এক মানব চরিত্র, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ইরাবতী ডলফিন, সমুদ্র, অরণ্য সবার সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কাহিনির মায়াজাল বুনে যান লেখক। গল্পের টানে উঠে আসে মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তু উৎখাতের ঘটনাও। শেষে এক প্রলয়ঙ্কর ঝড় আর তার পরবর্তীতে দীর্ঘকালীন গবেষণার জন্য পিয়ালির পাকাপাকিভাবে সুন্দরবনকেই নিজের 'হোম' করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি হয়। পড়তে পড়তে মনে হয় এই শীতেই তো তাহলে একবার ঘুরে আসা যায়। কাহিনির মানুষগুলোকে খুঁজে নাইবা পাই, অরণ্য আর সাগর তো তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত করবে না!

সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। লকডাউনের পর সত্যি ভ্রমণ আবার শুরু হয়ে গেছে অল্প অল্প করে, তার পাশাপাশি চলতে থাকুক 'আমাদের ছুটি'র সঙ্গে মনভ্রমণও।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ এই সংখ্যায় ~

চরৈবেতি

"পুরো পথটাই কালো পাহাড়ি অঞ্চল, শুকনো ঘাসে ঢাকা। ওপর দিয়ে বাজ আর কালো ফিঙের মতন এক ধরণের পাখি ঘুরপাক খাচ্ছে। এই পথে একলা চলতে চলতে অজানা আজগুবি ভয় মনের মাঝে দানা বাঁধা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়!"

সুদীপ্ত দত্তের ট্রেকিং-এর কাহিনি "নন্দাকিনীর উৎসমুখে"র দ্বিতীয় পর্ব

~ আরশিনগর ~

একা একা ঘুরে ঘারে হীরাবন্দরে – তপন পাল

টংলু টপে দিনদুয়েক – অরুণাচল চ্যাটার্জী

গ্রামের নাম মূলখরকা – অর্পিতা চক্রবর্তী

~ সব পেয়েছির দেশ ~

শীতকালে করবেটের জঙ্গলে – পাপড়ি সাহা

কুরিঞ্জি ফুলের দেশে – প্রজ্ঞা পারমিতা

~ ভুবনডাঙা ~

ফিনল্যান্ডের বসন্তে – সুপ্রিয় কুমার রায়

ভাঙা মন্দিরের দেশ কাম্বোডিয়া
(শেষ কিস্তি) – মলয় সরকার

~ শেষ পাতা ~

বাসাই দুর্গে একবেলা
– সৌম্য প্রতীক মুখোপাধ্যায়

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে – অরিন্দম পাত্র

© 2011 - 2021 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

নন্দাকিনীর উৎসমুখে

সুদীপ্ত দত্ত

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

~ রন্টি স্যাডল ট্রেক রুটম্যাপ || রন্টি স্যাডল ট্রেকের আরও ছবি ~

কালো গণেশ আর পাথুরে বাড়ি

পরদিন সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই চিঁড়ের পোলাওয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিলাম ভাগুয়াবাসার দিকে। হাতে সময় অনেক, তাই আগের দিন যেখানে চা-ওমলেট খেয়েছিলাম সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলাম সেই পাহাড়ের চূড়াগুলো আবার দেখব বলে। আকাশ মেঘলা থাকায় তখন দেখা যায়নি কিন্তু এদিন পরিষ্কার আকাশে পরপর চূড়াগুলো চোখের সামনে ফুটে উঠল। তবে এই পাহাড়ের সারি আমরা বেদনি বুগিয়ালে দেখেছি আর এর পরেও রাস্তায় অনেকবার দেখতে পাব তাই বেশি সময় নষ্ট না করে উঁচু পথ ধরলাম। এখান থেকে যে রাস্তা গেছে তা পুরোটাই পাহাড়ের শিরা বা রিজ বরাবর, আর তা ক্রমশঃই ওপরের দিকে উঠেছে। আমি মানবদার সঙ্গে খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকলাম। পুরো পথটাই কালো পাহাড়ি অঞ্চল, শুকনো ঘাসে ঢাকা। ওপর দিয়ে বাজ আর কালো ফিঙের মতন এক ধরণের পাখি ঘুরপাক খাচ্ছে। এই পথে একলা চলতে চলতে অজানা আজগুবি ভয় মনের মাঝে দানা বাঁধা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়!

একটু পরপরই রাস্তার পাশে পাথর দিয়ে ছোট বেদির মতো করা আর তাতে একটা ঘন্টা রাখা রয়েছে, ভাবটা এমন যেন ওই ঘন্টাটাকেই পুজো দেওয়া হয়। আসলে ওই ঘন্টা বাজিয়ে পেছনের লোককে জানিয়ে দেওয়া যায় যে সামনে আমি কতদূরে রয়েছি। সরু পথ দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দেখতে পেলাম আরও কিছু ট্রেকার এই পথ ধরে এগিয়ে আসছে। কিছু পরে নির্জন পথটা ট্রেকার আর মালবাহী খচ্চরে জমজমাট হয়ে গেল। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে আন্দাজ করে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আর কত পথ চলতে হবে, তবে পাহাড়ে ওদের হিসাব আর আমাদের হিসাব একেবারেই মেলে না। মোটামুটি দুই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় চলার গতি ধরে একটা সময় হিসাব করে এগোতে থাকলাম। পরপর কয়েকটা

পাশে ত্রিশূল আর অসংখ্য ঘন্টা লাগানো গণেশ ঠাকুরের মন্দির। পথে আসার সময় যেমন ঘন্টা রাখার জন্য পাথরের বেদি দেখেছিলাম এখানে গণেশের মন্দিরও সেরকম পাথরের বেদির মত। তবে গণেশের মূর্তি কালো পাথরের। স্থানীয় লোকদের মতে সারা ভারতের মধ্যে এখানেই একমাত্র কালো গণেশের পুজো করা হয়। পৌরাণিক মতে ব্যাসদেবকে অনুসরণ করে চলতে চলতে গণেশ ঠাকুর চড়া রোদে কালো হয়ে যান আর তার প্রতীক হিসাবেই এই মন্দিরে রয়েছেন কালো গণেশ বা কালৌ বিনায়ক। এখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই কুয়াশার মতো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, তবে সে মেঘে বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা কম। পাথর নাচুনি থেকে রওনা দিয়ে একটানা ঘন্টা তিনেক চড়াই পথে চলা হয়েছে, এখান থেকে ভাগুয়াবাসার দূরত্বও খুব বেশি নয়, তাই মনে হল এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যেতেই পারে। ক্যাপ্টেন অনেক আগে পৌঁছে সেই ছাউনি করা দোকানে চায়ের অর্ডার দিয়েই রেখেছিল। গরম চা খেতে খেতে মেঘের মধ্যে দিয়ে চারপাশের পাহাড়কে যতটা সম্ভব নজরে আনার চেষ্টা করলাম। কালৌ বিনায়ক একটা পাহাড়ের মাথায় হওয়ায় এখান থেকে উঁচু পাহাড়গুলোকে ছোট পাহাড়ের আড়াল এড়িয়ে সামনাসামনি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকায় সেই সুন্দর ছবি চোখের আড়ালেই লুকিয়ে রইল। নাছোড়বান্দা হয়ে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। তার মাঝেই মেঘের আড়াল থেকে মাত্র একবারের জন্য উঁকি দিল নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূল পাহাড়ের চূড়া, আর তাদের মাঝে আমাদের লক্ষ্যপথের শেষ সীমানা রন্টি স্যাডেল।

কালৌ বিনায়কের পরের রাস্তা পুরোটাই পাথরের, রাস্তায় চড়াইউতরাই নেই বললেই হয়, আর তার পাশে কিছু শুকনো ব্রহ্মকমল দেখতে পাওয়া গেল। পাথরগুলো নড়বড়ে আর কুয়াশাবৃষ্টিতে ভিজে থাকায় পিছলও বটে। তাই খুব সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে হল। কিছুটা এগোতেই খুব ছোট ছোট পাথরের ঘর দেখতে পেলাম। আনন্দের কাছ থেকে জানতে পারলাম ওগুলো নাকি শেপার্ডস হাট, ভেড়া চড়াতে এসে রাখালরা এখানেই বিশ্রাম নেয়। ওর মাঝে পাথরের একটা বড় ভাঙাচোরা ঘর দেখিয়ে বললো এটা নাকি কোনো এক রানির আঁতুড়ঘর বা "রানি কা সুন্তেলা" ছিল। মাত্র আধঘন্টা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে আমরা ভাগুয়াবাসা পৌঁছে গেলাম।

মেঘলা, কুয়াশাঢাকা ভাগুয়াবাসাকে প্রথম দেখায় একেবারেই ভালো লাগল না। রাস্তার পাশে একটা বড় পাথরবিছানো সমতল জমির ওপর অনেকগুলো টেন্ট বসেছে। আমাদের টেন্টটা পাহাড়ের একটা ঢালের ঠিক পাশেই। পাহাড়ের ঢালটা বেশ ময়লা আর একটু তলার দিকে দুটো টেন্ট টয়লেট বসানো হয়েছে। কুয়াশা-বৃষ্টিতে ভিজে পাথরগুলো স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে রয়েছে। অনেক ট্রেকার এসে পড়ায় লোকজনের ভিড় একটু বেশিই বলে মনে হল। একটু পরেই লাঞ্চ রেডি হয়ে গেল আর টেন্টেই খাবার পৌঁছে দেওয়া হল। গরম গরম খাবার পেটে পড়তেই আশ্চর্যভাবে যেন জায়গাটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করলাম। এখানে টেন্টের খুব কাছ থেকেই মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছিল, আর এই শেষ ক্যাম্প যেখান থেকে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা গিয়েছিল। বিকেলের দিকে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হতে ত্রিশূল পাহাড়ের একটা চূড়া নজরে এল। পড়ন্ত সূর্যের আলো মেঘ আর ত্রিশূলের চূড়ার ওপর পড়ে সেই পরিচিত লাল আভা ছড়িয়ে দিল। অন্য একটা ট্রেকিং দলের গাইড হয়ে মহিপৎ এখানে এসেছে। ও এসে আমাদের শরীর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করল। একটা অক্সিমিটার জোগাড় করে শরীরে অক্সিজেন চলাচল ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখে নিল।

সন্ধ্যা নেমে এলেও লোকজনের চলাফেরায় পুরো জায়গাটাই বেশ জমজমাট হয়ে রইল। ভাগুয়াবাসায় একটা ছাউনিফেলা দোকান রয়েছে, দিদনার এক বয়স্ক ভদ্রলোক সেই দোকানের মালিক। তাঁর এই দোকান প্রায় দশ বছরের পুরনো আর শুধু চা-বিস্কুটই নয় টর্চের ব্যাটারি, ফেভিকলের মতো ভীষণ দরকারি জিনিসও পাওয়া যায়। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসতেই গোল থালার মতো চাঁদ পাহাড়ের মাথার ওপর উঁকি মারল। চাঁদের আলো উপভোগ করতে করতেই দোকানির সঙ্গে আড্ডা জুড়ে দিলাম। পাথরনাচুনির গল্পটা আবারও একবার শুনে নেওয়া গেল। তবে ট্রেকিংয়ে মেয়েদের উপস্থিতি যে ওঁর খুব একটা পছন্দ নয় তা কথাবার্তাতেই ফুটে উঠছিল। শুনলাম রূপকুণ্ডের কঙ্কালের ইতিহাস। তবে ইতিহাসের চেয়ে পৌরাণিক কাহিনিতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন। জানালেন রূপকুণ্ড তৈরির পৌরাণিক কথা। একবার ভগবান শিব আর দেবী পার্বতী চলতে চলতে এই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হলেন। এতটা পথ চলতে চলতে দেবী পার্বতীর জলতেষ্টা পেল, কিন্তু এই রুক্ষ পাহাড়ে শিব কিভাবে সেই ব্যবস্থা করবেন? তখন তিনি নিজের ত্রিশূল দিয়ে পাহাড়ের গায়ে এমন জোরে আঘাত করলেন যে তার থেকে জল বেরিয়ে এসে এক লেক তৈরি হল! সেই লেকের জলে তেষ্টা মেটাতে গিয়ে দেবী পার্বতী নিজের রূপ দেখতে পেয়েছিলেন বলে এই লেকের নাম হল রূপকুণ্ড। দোকানি ভদ্রলোক আরও যোগ করলেন যে এই পথে অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু কখনোই ভূত-প্রেতের কোনো অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি, কারন এ স্থান যে দেবভূমি।
একে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, তার ওপর পাথুরে জমিতে ঠাণ্ডা নামে খুব তাড়াতাড়ি। সাড়ে সাতটা বাজতেই টেন্টে রাতের খাবার চলে এলো। ডাল, ভাত, রুটির সঙ্গে ডিমের কারি দিয়ে ডিনার সারা হল। এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমির ওপর ফেলা টেন্টে শান্তিতে ঘুমানো বেশ কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিস্তব্ধ ভাগুয়াবাসায় কখন যেন দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

রহস্যময় রূপকুণ্ড আর স্বপ্নের দেশ শিলাসমুদ্র

রাতভোর হওয়ার আগেই বাইরে বেশ একটা সাজো সাজো রব শোনা গেল। রূপকুণ্ড যাওয়ার ট্রেকিং দলগুলো রাত সাড়ে তিনটে-চারটের সময় রওনা দিয়ে দিল, ফিরতি পথে ওদের পৌঁছাতে হবে বেদনি বুগিয়াল। আমরা এপথে ফিরব না, তাই আমাদের আরও কিছুক্ষণ পরে বেরোলেও চলবে। ঘুমটাকে টেনে আরেকটু লম্বা করে যখন বাইরে আলোর আভাস দেখা গেল, টেন্টের চেন-দরজাটা খুলে দিলাম। ভোরবেলায় আকাশ একেবারে পরিষ্কার আর সামনে সেই পাহাড়ের সারি – নীলকন্ঠ, বালাকুন, চৌখাম্বা, জাহ্নুকুট, সতোপন্থ আর ভাগীরথী। সকালে অন্যান্য ট্রেকাররা না থাকায় রাঁধুনিদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে কাটালাম। এর পরের কদিন ওরাই হবে পথের একমাত্র সঙ্গী। ওদের মধ্যে বয়সে একটু বড় হীরা সিং হল হেড কুক, রান্নার সময় কিভাবে স্বাদ আর স্বাস্থ্যের ব্যালেন্স রাখতে হয় তা তার বিলক্ষণ জানা রয়েছে। ওর দুই সহকারী মনিন্দর আর বিনোদ যেন এনার্জির অফুরন্ত ভাণ্ডার। বহুদূর থেকে জল বয়ে নিয়ে আসা থেকে খচ্চরের জন্য ঘাস জোগাড় করা কোনোকিছুই যেন ওদের ক্লান্ত করতে পারে না।

শুধু এবার তা আরও সরু, পাশাপাশি দু'জন যাওয়াও বেশ বিপজ্জনক। কোথাও কোথাও রাস্তায় নড়বড়ে পাথর এতটাই বিপদের যে একটু অসতর্ক হলে গভীর খাদে তলিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। সুখেনদার কাছে জানতে পারলাম কয়েক বছর আগে এই রাস্তার একটি জায়গায় দেয়াল বেয়ে এক রকম রক ক্লাইম্বিং করে উঠতে হত, এখন সেখানে সিঁড়ি তৈরি হলেও সে পথে প্রাণ হাতে করেই চলতে হয়। শুধু তাই নয়, পাথুরে পাহাড়ে যখন তখন পাথর গড়িয়ে পড়াও অসম্ভব নয়। এতটা রুক্ষ পথে মাইলের পর মাইল হাঁটতে খুব যে আনন্দ পাচ্ছিলাম তা বলতে পারি না। অনেকটা হাঁটার পর পাথরের রাস্তা এবার নুড়িপথে পরিণত হল! এ রাস্তায় পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা ষোলআনা। যদিওবা ওপর দিকে ওঠা যায়, কিন্তু নিজের ওপর সম্পূর্ণ ব্যালেন্স রেখে নীচের দিকে নেমে আসা খুবই কঠিন। একটা চায়ের দোকান পার হয়ে গড়ানো পথে আর কিছুটা ওপরে উঠতেই পৌঁছে গেলাম রহস্যে ঘেরা লেক রূপকুণ্ডে, ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর বারোটা।

পাহাড়ের খাঁজে নুড়ি পাথরে ঢাকা একটা সমতলে খুব ছোট একটুকরো কালচে জলের আধার এই রূপকুণ্ড, কিন্তু লোককথায় এর মহিমা অসীম। প্রতি বারো বছর অন্তর এখানে ঘটা করে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এমন একটি প্রাকৃতিক লেক নুড়ি পাথরে প্রায় বুজে এসেছে, জলের পরিমাণ খুবই সামান্য। শীতে এর পুরোটাই বরফে ঢেকে যায়। লেকের পাশে কতগুলো হাড়গোড় স্তূপ করে রাখা রয়েছে। এগুলো লেকের ভেতর থেকে পাওয়া গিয়েছিল আর তারপরেই এ নিয়ে হয়েছে অনেক গবেষণা।

পাহাড়ের খাঁজে নুড়ি পাথরে ঢাকা একটা সমতলে খুব ছোট একটুকরো কালচে জলের আধার এই রূপকুণ্ড, কিন্তু লোককথায় এর মহিমা অসীম। প্রতি বারো বছর অন্তর এখানে ঘটা করে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এমন একটি প্রাকৃতিক লেক নুড়ি পাথরে প্রায় বুজে এসেছে, জলের পরিমাণ খুবই সামান্য। শীতে এর পুরোটাই বরফে ঢেকে যায়। লেকের পাশে কতগুলো হাড়গোড় স্তূপ করে রাখা রয়েছে। এগুলো লেকের ভেতর থেকে পাওয়া গিয়েছিল আর তারপরেই

বিখ্যাত বাঙালি পর্বতারোহী শম্ভুনাথ দাসের মতে এই কঙ্কালগুলো আসলে এখানে পুজো দিতে আসা পুণ্যার্থীদের, যারা ক্লান্ত পায়ে জুনারগলি যাওয়ার পথে ধ্বসে বা গড়ানো পাথরে পিছলে এই লেকে এসে পড়েছিল। এছাড়াও রয়েছে আরো অনেক মত, অনেক ধারণা। আমাদের পক্ষে এর কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা তা মিলিয়ে দেখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তবে কঙ্কালগুলো দেখার পর এই লেকের ধারে খুব বেশিক্ষণ কাটানোর আর ইচ্ছে রইল না। লেকের পাশে আলগা পাথর দিয়ে বানানো হরগৌরীর ছোট্ট মন্দির, আর তাতে রয়েছে শিব-পার্বতীর ফটো। পুজোর সরঞ্জাম বলতে কতগুলো ঘন্টা আর গোটা দুয়েক শাঁখ। অন্যান্য শিবমন্দিরের মতই এখানেও মাথার ওপর শোভা পাচ্ছে একখানা বড় ত্রিশূল। ক্যাপ্টেন আর মহিপৎ অনেক আগেই এখানে পৌঁছে গেছিল। একটু পর খচ্চর নিয়ে রাঁধুনিরাও এসে হাজির হল। বাবুদা আর মানবদা একটু পিছিয়ে পড়েছে। মনিন্দর মন্দিরের শঙ্খ বাজিয়ে আমাদের লেকে পৌঁছে যাওয়ার খবর জানিয়ে দিল।

মাত্র মিনিট পনেরো লেকের ধারে ঘোরাঘুরি করে ওপর দিকে জুনারগলির পথ ধরলাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মনিন্দররা খচ্চরগুলো নিয়ে পাহাড়ের ওপর অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আর ক্যাপ্টেন এগোতে থাকলাম, সঙ্গে চলল মহিপৎ, আমাদের জুনারগলি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রূপকুণ্ড থেকে এই পথ অসম্ভব খাড়াই, ধীরে সুস্থে না হাঁটলে মাঝপথেই বেদম হয়ে পড়তে পারি, তাই ভয়ে এক পা দু'পা করে এগিয়ে চললাম। খুব ধীরে ধীরে প্রায় ঘন্টা খানেক একনাগাড়ে চলার পর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেলাম রাস্তা শেষ হয়ে পাহাড়ের একটা শিরার মাথায় উঠে এসেছি। সেখানে একটা ভাঙাচোরা সাইনবোর্ড মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে, তাতে লেখা "জ্যুঁরাগলী" 'সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ৪৭৮৯ মিটার'। ট্রেকিংয়ে রওনা দেওয়ার আগে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এর উচ্চতা দেখেছিলাম ৫১৫০ মিটার বা তারও বেশি, কিন্তু এই সাইনবোর্ড দেখে একটু যেন হতাশই হলাম। যতক্ষণ মানবদা আর বাবুদা না পৌঁছায় আমি আর ক্যাপ্টেন এখানে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই টপের চারদিক আরও উঁচু উঁচু পাহাড়ে ঘেরা, তার ওপর জমাট কুয়াশা থাকায় বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তার মধ্যেই মহিপৎ আশেপাশের পাহাড়গুলো কোথায় কী আছে বলে যাচ্ছিল, কাছাকাছি কালো পাথরের মত কালি ডাক, একটু ওপরে চন্দনিয়া টপ আর সামনের বড় পাথরটার পেছনে রূপকুণ্ডের গ্লেসিয়ার, কিন্তু কোনোটাই আমার চোখে ধরা পড়ল না। শুধু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সামনের ত্রিশূল পর্বত, আর মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারা নন্দাঘুন্টি! বেশ কিছুক্ষণ পর বাবুদা আর মানবদা এসে পৌঁছাল। বেশ বুঝতে পারছিলাম অ্যান্টিবায়োটিকের অ্যাকশনে মানবদার শরীর আর এগোতে চাইছে না, শুধু মনের জোরকে সম্বল করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যাতে কোনোভাবেই আমাদের সবাইকে ফিরে না আসতে হয়। সবাই পৌঁছে গেলে আমরা মহিপৎকে বিদায় জানালাম, এত বেলায় রওনা হয়েও সে এখান থেকে ফিরে যাবে দিদনা!
প্রায় সোয়া একঘন্টা জুনারগলিতে কাটিয়ে আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। একটু উঁকিঝুঁকি মারতেই পাথরের পাশ থেকে একটা লুকিয়ে থাকা সিঁড়ির দেখা মিলল পাহাড়ের অপর ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামার জন্য। এ যেন এক গোপন পথ, কোনও এক অজানা অচেনা পৃথিবীতে পৌঁছে যাওয়ার চাবিকাঠি। সুখেনদা বলল, কিছুদিন আগে এ পথে পাথরের ওপর এরকম ধাপ করা ছিল না, একবার নিচের দিকে নামতে শুরু করলে মাঝপথে থামা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা নামার পর আকাশে হালকা রোদের ঝিলিক দেখা গেল, কুয়াশাও কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এল। খয়েরি রঙের ঘাসে ঢাকা এক সমতল পাহাড়ের মাথায় পৌঁছতেই চোখ জুড়ানো একটি ছবি সামনে ভেসে উঠল। নিচে রয়েছে এক স্বপ্নের উপত্যকা, তাতে তিন দিক থেকে তিনটে নদীর মত জলের ধারা একটি বিন্দুতে মিশেছে। নদীতে জল হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু সাদা পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলায় পাহাড়ের এত ওপর থেকেও আমরা ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তিনটে নদী মিলে দুটি 'ব' বা ডেল্টা আকৃতির অববাহিকা তৈরি করেছে। ডেল্টাগুলো এখানকার পাহাড়ের মতোই খয়রি ঘাসে ঢাকা। ডান দিকের ডেল্টায় একটা নদীর কাছাকাছি বিশাল কালো পাথরের পাশে দুটো সবুজ টেন্ট পাতা রয়েছে, ওটাই আজ রাতের ঠিকানা। আমাদের যেন আর তর সইছিল না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রায় ছুটতে ছুটতে নিচের দিকে নামতে থাকলাম।

কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে খুব কাছে মনে হলেও নিচ পর্যন্ত নামতে সময় লাগল দু ঘন্টারও বেশি। অবশেষে একটা নদীর ধারা পেরোতেই চোখে পড়ল সাইনবোর্ড 'শিলা সমুদ্র'। আর সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা? খুবই বিতর্কিত! পাশাপাশি দুটো সাইনবোর্ডের একটিতে লেখা ৩৮৯৫ মিটার আর অন্যটায় ৪০৪৫ মিটার! সামনেই টেন্ট, কিন্তু এই অপূর্ব সুন্দর পাহাড়ঘেরা উপত্যকার ছবি ক্যামেরাবন্দি না করে সেখানে পৌঁছানোর কথা মনেও আনতে পারছিলাম না। ক্লান্ত শরীরে একটা প্যানোরমিক ছবি তুলতে যেতেই মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হল। বিকেল তখন সাড়ে চারটে, অনেক আগে পৌঁছে হীরা, মনিন্দর আর বিনোদ ততক্ষণে টেন্ট খাটিয়ে খাবারের বন্দোবস্তও করে ফেলেছে। পৌঁছানোর পর এক মুহূর্তও দেরি না করে হাতে স্যুপ আর ম্যাগি তুলে দিল।

টেন্টগুলো যে পাতা হয়েছে একটা মস্ত পাথরের আড়ালে তা জুনারগলি থেকে নামার সময়ই দেখতে পেয়েছিলাম। এই কালো পাথরটা নাকি কোনও সময় পাহাড় থেকেই নেমে এসেছিল, আর ওর দৌলতেই প্রচন্ড ঝোড়ো হাওয়া থেকে আমাদের টেন্টগুলো বেঁচে যাচ্ছিল। পাথরের আরেক পাশে শেফার্ডদের ঘরের মত পাথরের টুকরো দিয়ে ঘিরে তার ওপর প্লাস্টিক বিছিয়ে বানানো হয়েছে রান্নাঘর। আমাদের কুক, পোর্টার আর গাইড এখানেই রাত কাটাবে বলে ঠিক করেছে। আমাদের টেন্টের কাছে কতগুলো ছোটো ছোটো আলগা পাথরবসানো মন্দির রয়েছে, এখানে বিগ্রহের বদলে রয়েছে এক একটি ছোট পাথরের অংশ আর ত্রিশূল। অধিকাংশ ট্রেকিং দল রূপকুণ্ড থেকেই ফিরতি পথ ধরে, জুনারগলি পেরিয়ে এপথে বড় একটা কেউ আসে না, তাই আগের ক্যাম্পগুলোর মত ঘিঞ্জি পরিবেশ এখানে নেই। আমাদেরও নির্জন শিলাসমুদ্রের সৌন্দর্য অন্য কারোর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হল না।

ত্রিশূল পাহাড়ের ঠিক পায়ের কাছে শিলাসমুদ্রের চারদিকই উঁচু পাহাড়ে ঘেরা। ত্রিশূল আর ডানদিকের বরফঢাকা একটা নাম না জানা পাহাড় এতটাই কাছে যে মনে হয় এই বুঝি সামান্য হাঁটলেই ওদের চূড়ায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। দুটো পাহাড়ের মাথাই দুধসাদা তুষারে ঢাকা আর সেই তুষারের নদী পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে এই উপত্যকার দিকেই।

ভাবতেও ভয় হচ্ছিল। তবে ছোটখাটো অ্যাভালাঞ্চ এখানে লেগেই থাকে আর তাতে যে বরফ খসে পড়ে তা থেকেই তৈরি হয়েছে এক মস্ত হিমবাহ।

শেষ বিকেলে কুয়াশা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এলেও নন্দাঘুন্টির দেখা মিলল না। পড়ন্ত সূর্যের আলো সাদা তুষারঢাকা ত্রিশূল পাহাড়ের ওপর পড়লেও পরিচিত লাল আভা খুঁজে পেলাম না। কনকনে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেল আর আনন্দরা তাঁবুতেই সেই খাবার পৌঁছে দিল। খুব তাড়াতাড়িই স্লিপিংব্যাগের আশ্রয় নিতে পারলাম। আগের ক্যাম্পসাইটগুলোর মত এখানে লোকজনের কোলাহল নেই। মালপত্র নেওয়ার খচ্চরগুলো ছাড়া নেই আর কোনও ঘোড়া বা খচ্চরের চিৎকার। কিন্তু একটানা নদীর শব্দ আর মাঝে মাঝে তুষার ভেঙে পাহাড় থেকে অ্যাভালাঞ্চ নেমে আসার আওয়াজে বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। এক ঘুম দেওয়ার পর মনে হল বুঝি রাত পেরিয়ে গেছে, ঘড়িতে দেখলাম রাত মাত্র সাড়ে দশটা, আবার ঘুম ভাঙলে ঘড়ি দেড়টার বেশি এগোয় না! এভাবে অনেকক্ষণ আধঘুম অবস্থায় কাটিয়ে শেষমেষ হাল্কা আলোর আভাস দেখা দিতেই টেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। একটু এদিক ওদিক তাকাতেই ঘাসের জমির ওপর দিয়ে কী যেন একটা নড়েচড়ে উঠল! দেখলাম বড় পাকানো শিংওয়ালা হরিণের মত দেখতে এক ধরনের জন্তু নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। খুব সাবধানে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ক্যামেরা বের করলাম আর বাকি তিনজনকেও ডেকে তুললাম। ক্যাপ্টেন বলল ওগুলো আইবেক্সজাতীয় পাহাড়ি ছাগল, স্থানীয় নাম ভরাল। শিলাসমুদ্রের এই পৃথিবীতে প্রকৃতিই রাজা তাই বন্য জীবজন্তু ঘুরে বেড়ায় বিনা বাধায় নির্ভয়ে। মানুষ এখানে ক্ষণিকের অতিথি, কেবল দর্শক মাত্র। সুখেনদা বলল এই ছাগলগুলো নাকি দল বেঁধে চলে আর পাহাড়ে চড়তে ভীষণ পটু, অনেক সময় পাহাড়ের গায়ে গা ঘষটে অনেকটা ওপরে উঠে যেতে পারে! তবে ভয় একটাই অনেক সময় পাহাড়ের ওপর থেকে এরা পাথর গড়িয়ে ফেলে আর তাতে মাঝে মধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটে যায়। কখনো কখনো ভরাল শিকার করতে গিয়ে পাহাড়ি চিতা চলে আসে ক্যাম্পের কাছে, তাই এদের দেখতে পাওয়া সব সময় যে সৌভাগ্যের হবে তা বলা যায় না! পাহাড়ি ছাগলগুলো অনেকক্ষণ আমাদের ক্যাম্পের আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করল। মনিন্দররা আবার একফাঁকে গিয়ে পাথরের ওপর কিছুটা নুন রেখে এল, ওরা নাকি নুন খুব ভালো খায়! আর সেই নুন খেতেই কয়েকটা ভরাল টেন্টের খুব কাছে চলেও এল! ওদের মধ্যে একটির মাথায় বেশ বড় শিং, সম্ভবত ও দলের নেতা, সতর্কচোখে চারদিকে নজর রাখছিল, আর বাকি ভরালগুলো নিশ্চিন্তে ঘাস খেয়ে চলেছিল। বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর সূর্যের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাথরের নদী আর চঞ্চলা নন্দাকিনী

শিলাসমুদ্র একটা ভ্যালি হওয়ায় সূর্য ওঠারও অনেক পরে এখানে আলো এসে পৌঁছায়, তাই এখানে পাহাড়ের চূড়ার লাল আভা দেখতে পাওয়া মুশকিল। তবে আকাশ পরিষ্কার থাকায় সামনে নন্দাঘুন্টিকে খুব কাছ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এদিনের চলার পথ সেই পাহাড়কে লক্ষ্য করেই, পৌঁছতে হবে ওরই পায়ের কাছে দোদাংএ। এর মাঝে একটা হিমবাহ পেরোতে হবে, আর সেটা করতে হবে রোদের তাপ বেড়ে বরফ গলে যাওয়ার আগেই। তাই রাস্তা খুব বেশি না হলেও আমরা সকাল ন'টার মধ্যে শিলাসমুদ্র ছেড়ে রওনা দিলাম। জুনারগলি থেকে আসার সময় তিনটে জলের ধারার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে নালাটা দেখতে পাচ্ছিলাম এগিয়ে গেলাম সেদিকেই। পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে ওঠা লাল-হলুদ বাহারি গাছ আর ছোটো ছোটো ফুলে শিলাসমুদ্র যেন সেজে উঠেছে। এদিকে একটা ছোটো হেলিপ্যাডও বানানো হয়েছে, আপৎকালীন উদ্ধারকাজে হয়তো তার ব্যবহার হয়। হেলিপ্যাডের পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগোতেই হিমবাহের ওপর মোরেন জোন দেখতে পেলাম।

অসংখ্য পাথরের বোল্ডার একটা খাতের মধ্যে জমা হয়ে যেন পাথরের একটা নদী তৈরি হয়েছে। এই পাথরের নদী পেরিয়ে পৌঁছাতে হবে অন্য পাড়ে। কিন্তু এই নদীর কিনারা পর্যন্ত পৌঁছানোই তো এক দুঃসাধ্য কাজ! একটা গড়ানো পাথরের ঢালু রাস্তা নেমে গেছে পাথুরে নদীর তীর পর্যন্ত। কোনোরকমে চলার মতো এই রাস্তা আনন্দ নিজেই বানিয়ে নিয়েছে! এর মধ্যে বাবুদা ট্রেকিংএর ঠিক আগে যে নতুন জুতোজোড়া কিনেছিল তা পড়ে চলতে অসুবিধা হওয়ায় মানবদার সঙ্গে বদলা-বদলি করে নিয়েছিল। এখানে তাই দুজনকেই নিজেদের অচেনা জুতো পড়ে নিচে নামতে হবে। এই সরু রাস্তার বাঁ দিকটা খোলা, আর তার নিচে সেই অগুনতি পাথরের নদী। তাই মুহূর্তে অসতর্কতায় কেউ যদি ব্যালেন্স হারিয়ে সেদিকে চলে যায়... এরপর আর ভাবতেও ভয় হচ্ছিল। ছোটোবেলায় হলে চোখ বুজে এখানেই দাঁড়িয়ে যেতাম আর হাজার চেষ্টাতেও কেউ এক

অবশেষে আনন্দের সাহায্য নিয়ে প্রায় গড়িয়ে খানিকটা হাঁচোড়পাঁচোড় করে নিজেদের নদীর কিনারায় নিয়ে ফেললাম। এমন ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না, কখনওবা 'ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম', তাই বাবুদা নিজের মোবাইলে পুরো অভিজ্ঞতা রেকর্ড করে নিল। তবে এ তো সবে পাথর-নদীর ধার, পেরোতে হবে পুরো মোরেন জোনটাই! এমন পথে যাওয়ার কোনও ধারণাই আমার ছিল না, তাই ক্যাপ্টেন আমায় দেখিয়ে দিচ্ছিল যে এই পাথরের নদীর নিচে রয়েছে জমাট বাঁধা বরফ, যা আসলে একটা হিমবাহ। সেই বরফ কোথাও কোথাও গলে নদীর আকার নিয়েছে। এই হিমবাহ গলার জায়গাটাকে বলে স্নাউট পয়েন্ট, আর এরকমই একটা স্নাউট পয়েন্টের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। এবার বড় বড় পাথরের ওপরে পা ফেলে মোরেন জোন পেরোনোর পালা। সমস্যা একটাই, কিছু পাথর বেশ নড়বড়ে, আর একটু ডিসব্যালেন্স হলে হয় পা মচকাবে নয়তো হাড়গোড় ভাঙবে। আবার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না, নীচের বরফ গলতে শুরু করবে। অনেকটা এক্কাদোক্কা খেলার মতো পাথরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে অবশেষে সেই নদী পেরোনো গেল। নদী পেরিয়ে একটা ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই নতুন এক জগৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। একপাশে নন্দাঘুন্টি পাহাড় আর তার পাশ দিয়ে প্রবল স্রোতে নেমে এসেছে নন্দাকিনী নদী, অন্য পাশে রয়েছে রংবাহারি ঘাস, লাল ছোট ফল আর জংলি ফুলের উপত্যকা। রন্টি স্যাডেল যাওয়ার পথে সবচেয়ে ভালো বিষয়টা হল যখনই কোনও কঠিন পথ পেরোনো হয়েছে তার ঠিক পরপরেই পাওয়া গেছে চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মত এক প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাই এতদিন একনাগাড়ে পথচলা হলেও কখনোই তা একঘেয়ে বিরক্তিকর হয়ে ওঠেনি।

সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে হিমবাহের বরফ গলার আগেই মোরেন জোন পেরিয়ে যাওয়ায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এর পরের পথ বিশেষ চ্যালেঞ্জিং নয়। কখনও পাহাড়ের গায়ে খয়েরি-সবুজ ঘাসের মাঝে মাটির পথ আবার কখনও নদীর ধারের পাথুরে পায়ে চলা পথ ধরে ধীরেসুস্থেই চলতে থাকলাম। পথে চড়াই কম, মোটামুটি সোজা রাস্তাই বলা যায়। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় ঘেউথাপ্পানের কাছাকাছি পৌঁছে বিশ্রামের সময় হল। আনন্দ জানাল ব্যাগপত্তর আর রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে বিনোদরা এখনও এসে পৌঁছায়নি, তাই বেশ কিছুটা সময় রয়েছে এই সুন্দর জায়গাটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার জন্য। রোদের তাপ আস্তে আস্তে বাড়ছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে। সামনে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে নন্দাকিনী নদী, কিন্তু তার জল বালি-পাথরে ভরা। ক্যাপ্টেন শিখিয়ে দিল যে নদীর ধারের দিকে শ্যাওলাপড়া জমির ওপর দিয়ে যে জল বয়ে যায় সেই জল অনায়াসে খাওয়ার জন্য নেওয়া যেতে পারে। সেইমতোই আমরা বোতলে ঠাণ্ডা জল ভরে নিলাম আর প্রাকৃতিক কোল্ডড্রিঙ্কস-এ গলা ভেজালাম। ব্যাগ থেকে আস্তে আস্তে বিস্কুটের প্যাকেট আর শুকনো খাবার বেরিয়ে এল, তাই দিয়েই দুপুরের টিফিন সারা হল। আনন্দ সেই লোহাজং থেকে একখানা রামধনুর মতো সাতরঙা ছাতা নিয়ে পথ চলছিল, এখানে এসে সেটা মেলে রোদের আড়াল খোঁজার চেষ্টা করল। নদীর ধারের এই জায়গা থেকে আঁকাবাঁকা নন্দাকিনীকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। পরের পথের প্রায় পুরোটাই পাথুরে আর সাদা ছাইয়ের মতো রঙের।
কিছুক্ষণ পর রাঁধুনি আর পোর্টাররা এসে পড়লে আবার এগোতে শুরু করলাম। এপথে কোথাও কোথাও পথের ধারে লাল রঙের বাহারি পাতার গাছ, কোথাও ছোট ছোট বুনো ফল দেখতে পেলাম। কোথাও কোথাও দু-এক গোছা জংলি ঘাসও রয়েছে, কিন্তু তা খচ্চরের খাবার জোগানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তাই বিনোদ আর মনিন্দর অনেক দূর থেকে জোগাড় করা ঘাস পিঠে-মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলেছে পরের ক্যাম্পের দিকে।

হঠাৎই পাহাড়ের ওপরে একটা শব্দ শুনতে পেলাম, ওপরদিকে তাকিয়ে দেখি বেশ কিছু পাথর ধুলো উড়িয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। আনন্দ বলল, পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে, তবে তা খুবই ছোটখাটো আর আমাদের রাস্তা থেকে অনেক দূরে, তাই চিন্তার কিছু নেই। নদীর ধার বরাবর কিছুদূর যাওয়ার পর একটা পাথরের মন্দির চোখে পড়ল, এর নাম "ছোটা হোমকুণ্ড"। যদিও এখানে একটা সাইনবোর্ডে হোমকুণ্ড লেখা এবং সমুদ্র থেকে উচ্চতা ৫১০০ মিটার বলা হয়েছে, কিন্তু এই যায়গাটা জুনারগলির চেয়ে উঁচু মনে হল না। ছোটা হোমকুণ্ডের পাশে একটা পাথরে ঘেরা দুর্গ মতন করা রয়েছে তবে এর আশেপাশে কোনো "কুণ্ড" জাতীয় জলার দেখা পেলাম না, কী জানি হয়তোবা নজর এড়িয়ে গেল!
ছোটা হোমকুণ্ড পেরোতেই একটা বিশাল পাথরের আড়ালে সবুজ টেন্টগুলো চোখে পড়ল, এর মধ্যেই পোর্টাররা গিয়ে সেখানে ক্যাম্প বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পৌঁছাতে গেলে আবারও পেরোতে হবে অনেকটা বোল্ডার জোন, সেই এক্কা-দোক্কা খেলা, পাথরের ওপর লাফালাফি! তবে এবার পাথরগুলো ততটা নড়বড়ে নয় আর এখানে নিচে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। পাথরের ওপর পথের কোনো অস্তিত্ব নেই, তবে তার শেষ মাথায় আবার পায়ে চলা পথের আভাস দেখা যাচ্ছে। সেদিকে নজর রেখে সাবধানে পাথরের ওপর পা ফেলে চলতে থাকলাম। বোল্ডার জোন পেরোতেই একটা কাঠের পুল চোখে পড়ল। সেদিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে ওপারে খয়েরি ঘাসের মধ্যে থাকা ভরালগুলো নজর কেড়ে নিল। এখানে মানুষজনের উৎপাত নেই তাই দিনদুপুরের ওরা নির্ভয়ে খোলা জমিতে চড়ে বেড়াচ্ছে। সামনের ভরালটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেই ও বোধহয় লজ্জা পেয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। কাঠের পুল পার করে দোদাং-এ পা দিলাম। পুলের ঠিক বাঁপাশে সিঁড়ির মতো একটা ঢালু রাস্তা নেমে গেছে ক্যাম্পের দিকে। শিলাসমুদ্রের চেয়ে অনেক অনেক বড় একটা পাথরের আড়ালে আমাদের থাকার টেন্টগুলো পাতা হয়েছে। বিকেল তখন পৌনে তিনটে, সূর্যের আলোর তেজ সেরকম কমেনি, কিন্তু একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত সবসময় বয়ে চলেছে। তবে টেন্টটা পাথরের আড়ালে হওয়ায় সেই হাওয়ার দাপট থেকে অনেকটাই রক্ষা পাচ্ছে। সেই কাত হওয়া পাথরের ওপর পলিথিন খাটিয়ে রান্নাঘর আর গাইড পোর্টারদের থাকার জায়গা করা হয়েছে। খচ্চরগুলোকে বেঁধে রাখা রয়েছে পুলের কাছাকাছি।

সুখেনদা অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল, আমি আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবুদাও পৌঁছে গেল। তবে মানবদা দুর্বল শরীরে বেশ কিছু পরে ক্যাম্পে পৌঁছাল। এখানেও টেন্টগুলো শক্ত পাথরের ওপরে পাহাড়ের ঢালে ফেলা হয়েছে তাই রাতে যে ঘুমোতে একটু সমস্যা হতে পারে তা আঁচ করে নেওয়া গেল। সুখেনদার কাছে জেনেছিলাম কাছাকাছি জলের জোগান না থাকলে ক্যাম্প বসানো সম্ভব নয়, কিন্তু এখানে নন্দাকিনী নদীর ধারা বয়ে গেছে দোদাংয়ের অনেক নীচ দিয়ে। সেখান থেকেই জল বয়ে নিয়ে এসে আমাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পপকর্ন আর চা পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। বাবুদা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত, যেখানেই ফুরসত মেলে সেখানেই সমস্ত অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসমেত চারপাশের পরিবেশের ভিডিও মোবাইলে রেকর্ড করে নেয়, আর সক্কলের সঙ্গে কথা বলে তাদের মধ্যে ক্লান্তির ছোঁয়াটুকুও লাগতে দেয় না। এদিকে নতুন জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়ে যে যন্ত্রণা হচ্ছে তা বাবুদার মুখ দেখলে একটুও বোঝা যাবে না। এখানেও রান্নাঘরে হীরা, বিনোদ আর মনিন্দরের সঙ্গে কথা বলে এসে বসে গেল আনন্দের ইন্টারভিউ নিতে। 'কাল সকাল চারটেয় ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়তে হবে', 'রাস্তা ভীষণ চড়াই', 'ঠাণ্ডার জন্য গ্লাভস সঙ্গে রাখবেন আর বরফে যাতে চোখ ঝলসে না যায় তাই সানগ্লাস' এরকম কিছু ভয়-পাওয়ানো কথার মধ্যে দিয়ে নিজেদের মানসিক প্রস্তুতি সেরে নিলাম।

দোদাংয়ের পুরোটা পাহাড়ে ঢাকা না হলেও আশেপাশে অনেকগুলো উঁচু চূড়া দেখা যায়। খুব কাছে, প্রায় ঢিলছোঁড়া দূরে দেখা যাচ্ছে নন্দাঘুন্টিকে। অন্যপাশে চোখের আন্দাজে প্রায় একই রকম দূরে রয়েছে ত্রিশূল। মাঝে একটা নাম না জানা রুপোলি পাহাড়, পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়ে তা চকচক করতে লাগল। এই পাহাড়ের দুপাশ থেকে পাথরের সারি নেমে এসেছে দোদাং লক্ষ্য করে। আশপাশের সবগুলো ছোট পাহাড়ই যেন গড়ানো নুড়ি-পাথরের চাদরে ঢাকা! পুলের কাছে গেলে শিলাসমুদ্র আর জুনারগলিও চোখে পড়ে, আর উল্টোদিকে দূরে পাহাড়ের ওপর দেখতে পাওয়া যায় আঁকাবাঁকা বরফের রেখায় ফুটে ওঠা রন্টি স্যাডলের পথ। ত্রিশূল অভিযানের জন্য একটু দূরে একটি পর্বত অভিযাত্রীদল ছাউনি ফেলেছে, এটাই ওদের বেস ক্যাম্প।

দোদাং-এ সৌন্দর্য শিলাসমুদ্র বা বেদনি বুগিয়ালের মত নয়, নিতান্তই সাদামাঠা। তবে নির্জন টেন্ট এরিয়ার নিচ দিয়ে বয়ে চলা নন্দাকিনী নদী, আশেপাশের চকচকে পাহাড় আর দুষ্প্রাপ্য ভরাল-এর উপস্থিতির জন্যেই পাহাড়ি ক্যাম্পসাইট হিসাবে দোদাং তার আভিজাত্য ধরে রেখেছে। আনন্দের আনা রেডিওর গান শুনে আর নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিতে দিতেই সন্ধ্যা নেমে এল। একটু পরে ভাতের সঙ্গে পনির আর ডিমভাজার কুচি দিয়ে রাতের খাবার সেরে টেন্টে আশ্রয় নিলাম। হয়তো অক্সিজেনের অভাবেই হবে, মাথাটা সামান্য ধরা ধরা লাগল। নন্দাকিনীর স্রোতের একটানা শব্দ আর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা সত্ত্বেও চেষ্টা করলাম তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার, পরদিন রাতভোরেই যে বেরিয়ে পড়তে হবে রন্টি স্যাডলের পথে।

~ ক্রমশঃ ~

~ রুপিন স্যাডল ট্রেক রুটম্যাপ || রুপিন স্যাডল ট্রেকের আরও ছবি ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকার সহসম্পাদক সুদীপ্ত দত্ত ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নিরালার খোঁজে। নতুন জায়গার সাথে মিশে আপন করে নেন সেখানকার জীবন, সংস্কৃতি আর খাদ্যাভ্যাস। তারপর তাঁর প্রিয় পত্রিকাটির পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন সেই যাত্রাপথের খুঁটিনাটি।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

একা একা, ঘুরেঘারে, হীরাবন্দরে

তপন পাল

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

-৪-

বারুদকল থেকে ওই রাস্তা ধরেই কিছুটা গিয়ে বিড়লাপুর; সেখান থেকে ডোঙ্গারিয়া বিবিরহাট হয়ে 'বনে এলি গেলি' - 'বাওয়ালি'। বাওয়ালির প্রাচীন মন্দির কমপ্লেক্সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জীর্ণ কয়েকটি মন্দির, রাসমঞ্চ, জলটুঙ্গি (হ্রদের মধ্যে তৈরি করা গ্রীষ্মাবাস), নাটমন্দির, হাওয়াখানা। তৎকালীন জমিদার মণ্ডল (রায়) পরিবারের এই মন্দিরচত্বরে পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলী ও পোড়ামাটির ফলক পাশাপাশি। পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপি অনুযায়ী গ্রামের প্রাচীনতম পুরাকীর্তিটি হল ১৭৭১ সালে হারাধন মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত ৭০ ফুট উঁচু আটচালা রাধাকান্ত মন্দির। একদা নাকি এটি টেরাকোটা সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। সামনেই ভগ্ন নাটমণ্ডপ ও পরিত্যক্ত আটকোনা রাসমঞ্চ। এছাড়াও রয়েছে ৭০ ফুটের গোপীনাথের নবরত্ন মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির, লক্ষ্মী জনার্দন মন্দিরগুলি। একসময় বাওয়ালি রথও ছিল সুবিখ্যাত। কালীমন্দিরের পশ্চিম দিকে রয়েছে শ্যামরায়ের মন্দির। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাওয়ালির জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

ব্যবসায়িক ছোঁয়ায় ভোল বদলেছে বাওয়ালি রাজবাড়ি, ঢোকার মুখেই বড় বড় সিঁড়ি, কারুকাজকরা থাম, দীর্ঘ উঠোন, বারান্দা; তৈরি হয়েছিল মণ্ডল পরিবারের হাতে। রাজারাম মণ্ডল ছিলেন হিজলির রাজার সেনাপতি। বীরত্বের জন্য তিনি লাভ করেন পঞ্চাশ বিঘা জমি আর বিস্তর ধনদৌলত। তাঁর হাতেই বাওয়ালি রাজবাড়ির পত্তন। তারপর যা হয়, এক পুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গলগ্রহ।

সেখান থেকে বাবা বড়োকাছারির থান; দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ গ্রামীণ পশ্চাদভূমির অন্তঃপাতী অতীব জনপ্রিয় এই উপাসনাস্থল। থানটি বাউন্ডুলে শিব ও অনার্য মাতার সন্তান বাবা পঞ্চানন্দের; তাই শিবের সঙ্গে পঞ্চানন্দের দেহাকৃতি ও বেশভূষার সাদৃশ্য আছে। পঞ্চানন্দের গাত্রবর্ণ লাল, রুদ্রবদন ক্রোধোদ্দীপ্ত ত্রিনেত্র; টিকালো নাক, দাড়ি নেই, গোঁফ কান অবধি বিস্তৃত, মাথায় পিঙ্গলবর্ণের জটা চূড়া করে বাঁধা, কিছু বুকে পিঠে ছড়ানো। কানে ধুতুরা ফুল। উর্ধাঙ্গ অনাবৃত; নিম্নাঙ্গে বাঘছাল অথবা ধুতি, গলায় ও হাতে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষমালা, হাতে ত্রিশূল ও ডমরু; পায়ে খড়ম, কাঁধে সাপ আর পাশে পাঁচমুখো গাঁজার কলকে। এঁর অনুচর জ্বরাসুর, সঙ্গী ভূত, প্রেত, ঘোড়া, বাঘ। একটা গল্প বলি শুনুন।

সে অনেক অনেকদিন আগের কথা; তখনও এ দিগরে ইলেক্টিরি আসেনি। একটা লোক কী কাজে সদরে গিয়েছিল; ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। নিশুতি, নিকষকালো অন্ধকারে শর্টকাট করতে সে হাঁটছিলো রাস্তা ছেড়ে মাঠ বরাবর; হঠাৎ দেখে কী মাঠের মধ্যে গাছপালার আড়ালে ম্যারাপ বেঁধে হ্যাজাক পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে যাত্রাপালা চলছে। হইহই কাণ্ড, সেও বসে গেল। তখন, জানেন তো বাবুমশাইরা, যাত্রাপালা হত হোল নাইট, মানে যাকে বলে কিনা সারারাত। সারাদিনের হটরানি, তা ভোরের দিকে লোকটার চোখ একটু জড়িয়ে এসেছিলো। যখন ঘুম ভাঙল, দেখে কোথায় কী! কোথায় ম্যারাপ, কোথায় হ্যাজাক আর কোথায় পেট্রোম্যাক্স!! সব ফর্সা। আসলে বুঝলেন কী না তো বাবুমশাইরা, যাত্রাপালাটা ছিল ভূতেদের, বাবা পঞ্চানন্দ স্বয়ং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে যাত্রাপালা দেখছিলেন।

বাবা একটু রগচটা বদমেজাজি বটে, কিন্তু দয়ালুও। তাঁর কাছে এসে কেউ খালি হাতে ফেরে না; তবে বাবার ভুলোমন তো, তাই সব প্রার্থনা লিখে জানাতে হয়। তোমার মনোবাঞ্ছা সাদা কাগজে লিখে, কোনে ছ্যাঁদা করে, লাল সুতো দিয়ে বেঁধে বাবার গাছে ঝুলিয়ে দাও, বা মন্দিরের রেলিংয়েও দিতে পারো; দেখবে তোমার প্রার্থনা পূরণ হবে। আসলে বোঝোই তো, কাছারি বলে কথা! কাছারি শব্দের মানে জানো তো! দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত, দফতর, অফিস, জমিদারের নায়েবের কার্যালয় এইসব। এখানে কী আর মুখের কথা চলে? লিখিতং পড়িতংই ভালো। তারপর প্রার্থনা পূরণ হলে, ইচ্ছা হলে তখন এসে পুজো দিয়ে যেও, বাতাসা, চিনির রঙিন মঠ দিয়ে। তবে বাবা শোলমাছ, আসব আর গাঁজা ভালবাসেন। তোমার ইচ্ছা হলে তাও দিতে পারো। এখানে মূর্তি নেই, একটি বড় অশ্বত্থ গাছ বাবার প্রতীক, তাকে ঘিরে মন্দির। ১৯৭৮ এর বন্যায় মূল অশ্বত্থগাছটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় স্থানীয় লোকজন সেই গাছটির পাশে আরেকটি অশ্বত্থ লাগান, কালক্রমে সেই এখন পুরনোর জায়গা নিয়েছে। অশ্বত্থ গাছটির পাতাগুলি কিঞ্চিৎ সাদাটে, পুরোহিত অব্রাহ্মণ।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিশীলনের দায় বাবার ঘাড়েও। শহুরে রুচির সঙ্গে মানাতে গাছতলায় এখন ত্রিশুল বসেছে,

এসেছে, ছিঃ! ছেলেপিলে এসব দেখে কী শিখবে! তবে হুঁ হুঁ বাবা, আমাকে ওসব গপ্পো শুনিয়ে লাভ নেই। আমার ঠাকমা আর দিদিমা দুজনেই মেটেবুরুজের মেয়ে, তাঁদের মুখে এই থানের কাহিনি অনেক শুনেছি।

বাবা বড়কাছারির মূল খ্যাতি সন্তানেচ্ছা পূরণের জন্য। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আছে, 'কামারহাটে পঞ্চানন্দ বন্দে জোড় হাতে। ছেলেদের জন্য কত মেয়ে ওষুধ যায় খেতে'। তবে মানুষের সমস্যার তো শেষ নেই, তাই মামলা মোকদ্দমা, রোগ ব্যাধি, প্রেমে বাধা, বিবাহে বিলম্ব, পরীক্ষা পাস, চাকরি লাভ, সবকিছুর জন্যেই হিন্দু-মুসলমান সবাই এখানে পুজো দিতে আসে। পূজা পদ্ধতি অতীব সরল, দোকান থেকে বাতাসা, চিনির রঙিন মণ্ড, বেলপাতা, গাঁজা, গাঁজার কলকে, আকন্দর মালা কেনো, কিনে বাবার পুকুরে যাও। স্নান করতে পারলে ভাল, না পারলে অন্তত হাঁটুজলে নেমে ঘট ভরো। এবারে গাছতলায় গিয়ে ধুপ জ্বালিয়ে সব দিয়ে দাও; আর হ্যাঁ, দক্ষিণাটা ভুলোনা। জানোই তো! দক্ষিণান্ত না করলে পূজা সিদ্ধ হয়না।

সন্তানলাভের আশায় এবং সন্তানলাভের পর ধন্যবাদজ্ঞাপনে মানুষ এখানে আসে। শর্ত দুটো। এক, সন্তান নিয়ে এলে সব সন্তানকেই আনতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি দ্বাদশতম সন্তানলাভের পর ধন্যবাদজ্ঞাপনে এখানে আসেন তাহলে পূর্ববর্তী একাদশ জাতকের কাউকেই বাড়িতে রেখে আসা যাবে না, নিয়ে আসতে হবে। দুই, এখানে এলে না খেয়ে বাড়ি ফিরবে না। মঙ্গলবারে ও শনিবারে বেশি ভিড় হয়, সন্তান নিয়ে দূরদূরান্ত থেকে ম্যাটাডোর ভাড়া করে, তাতে ব্যান্ডপার্টি চাপিয়ে, অনেক আত্মীয়স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী নিয়ে লোকজন আসে; দিনভর থাকে, রাঁধে বাড়ে খায়; সে এক দেখার মত ব্যাপার। সন্তানলাভের পর ধন্যবাদজ্ঞাপনে পুকুরে স্নান করে, দন্ডি কেটে পুজো দিতে হয়। সঙ্গে ছেলে হলে একটা মাটির গোপাল আর মেয়ে হলে একটা মাটির লক্ষ্মী, সঙ্গে সন্তানের ওজনের সমপরিমাণ বাতাসা।

বড় কাছারির কোন লিখিত ইতিহাস নেই। তবে আজকাল ঐতিহাসিকরা শুনছি মৌখিক ইতিহাসকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাই একটু গালগল্প করা যাক। আলিবর্দি খানের শাসনকালের শেষ দিকে মারাঠা বর্গিদের উৎপাতে স্থানীয় গ্রামের লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে এক শ্মশান সন্নিহিত জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলো। বর্গীরা, ধর্মীয় সংস্কারেই হোক কিংবা ভূতের ভয়েই হোক, সেখানে যায়নি। তারপর, বৃষ্টিশেষের রামধনুর মত, সেই শ্মশানে আসেন এক সাধু। অলৌকিক ক্ষমতাবলে তিনি গ্রামের লোকজনদের সমস্যা মিটিয়ে দেন, রোগবালাই দূর করেন। মারাঠাদের দৌরাত্ম্যশেষে গ্রামটি আবার সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। সাধুর মৃত্যুর পর সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়; আর সেখানেই গজায় সেই সাদাপাতার অশ্বত্থ। বাজারে রটে যায়, মৃত্যুর পরে গ্রামবাসীদের রক্ষার্থে এই অশ্বত্থগাছের রূপে তিনি ফিরে এসেছেন। ব্যস! শুরু হয়ে গেল।

মন্দিরে ঢোকার অনেক আগে থেকেই বেশ মেলা বসে গেছে! বাচ্চারা আসে, স্বাভাবিকভাবেই দোকানিরা খেলনা সাজিয়ে বসেছেন। খাবারের দোকান, লুচি, কচুরি, রাধাবল্লভী, ডালপুরি, নান, পেটাপরোটার অবাধ আয়োজন। আমি বাবার জন্য এক বোতল বিলাইতি নিয়ে গিয়েছিলাম। গাছের গোড়ায় ঢালার জন্য ছিপি খুলতে যেতেই পূজারী আর্তনাদ করে উঠলেন, খুলবেন না, খুলবেন না, এখানকার জলই চরণামৃত, শিশুরা খায়। তাঁর স্বাস্থ্যচেতনায় আমি অভিভূত হলাম, নির্নিমেষ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে, তিনিও আমার দিকে; কেটে গেল প্রহর। তারপর করুণ স্বরে জিজ্ঞাসিলেন 'প্রসাদ লাগবে'? আমি আর কী বলি, বললাম 'না, ওটা আপনি রাখুন।'

তা বড় কাছারি যখন, তখন নিশ্চয়ই ছোট কাছারি আছে কাছাকাছি; ব্রিটিশ আমলে যেমন বড়লাট থাকতেন রাজভবনে আর ছোটলাট এখনকার জাতীয় গ্রন্থাগারে। অবশ্যই! ছোট কাছারি তো আছেই, একটা নয়, দুটো। প্রথমটি জোকা আই আই এম-এর আগে, যেখানে আগে ট্রাম ডিপো ছিল, সেখান থেকে চড়িয়াল খাল বরাবর পূর্বদিকে, হাঁসপুকুরিয়া পেরিয়ে শাঁখারিপোতায় খালের ধারেই এক হেলানো অশ্বত্থগাছ ঘিরে। মন্দিরটি বেশ বড়, সদ্যনির্মিত, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তাটি হওয়ার সময় ঠিকাদারকে ধরে হয়েছে; কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারনা পাওয়া যায়; হেলে পড়া অশ্বত্থগাছটির বয়স কম করেও দেড়শো বছর। পাশের কবরস্থানে শোনা গেল মামদো (মৃত মুসলমান ব্যক্তির আত্মা)ভূতেরা থাকেন; তবে মধ্যে মধ্যে পেত্নি (প্রেতিনী, অবিবাহিতা মহিলার ভূত, সুপুরুষ যুবকে আগ্রহী) বা শাঁকচুন্নি (বিবাহিতা মহিলার ভূত, পরনে লালপাড় শাড়ি, হাতে হাড়ের উপর ঢলঢলে শাঁখা, সাধারণত বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে ধনী বিবাহিতা মহিলাদের ভর করে) বা 'শাকিনী' (যারা বিয়ের পরে অসুখে বা নির্যাতনে আত্মহত্যা করেছে) বা 'মোহিনী' (যারা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছে)-রাও এখানে হাওয়া এবং চা খেতে আসেন। শোনা গেল বছর পঞ্চাশ আগে অবধি এদিকে 'বেগোভূত' (বাঘের আক্রমণে মৃত মানুষের ভূত) দেখা যেত, এখন আর যায় না। প্রসঙ্গত, বেহালা সরশুনা ঠাকুরপুকুর, বড়িশার প্রধান নিকাশি নালা বেগোর খাল তার নাম পেয়েছে এমন ভূতের থেকেই। ভূতেদের লিঙ্গভেদ আছে, আছে লিঙ্গবৈষম্যও; আছে জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং। ভূতেদের জীববৈচিত্রে মহিলাদের প্রাধান্য মহিলাদের প্রতি বিগত যুগের সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক নির্ভুল অভিজ্ঞান।

বাবুমশাইরা তো জানেনেই, ভূত শব্দটির উৎস সংস্কৃত ভূ ধাতু, যার অর্থ হওয়া; টু বি, বা প্রকাশিত হওয়া; টু ম্যানিফেস্ট। সেই অর্থে ভূত শব্দের শব্দার্থ আ বিয়িং, বা বড়জোর অ্যান এক্সিটিং প্রেজেন্স। সেই অর্থে আপনি আমি, বাঘ সিংহ, পায়রা মুরগি সবাই-ই ভূত। তবে ভূত শব্দটি যুগপৎ অতীত নির্দেশকও, যথা ভূত ভবিষ্যৎ বা ভূতকাল। এইবারে একই শব্দ যদি একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের দ্যোতনা দেয়, তখন আমাদের হয় মরণ! আমরা ভাবতে বসি, অতীত কি তবে শুধুমাত্র অতীত নয়, বর্তমানেও তার অঙ্গাঙ্গী উপস্থিতি!! যখন চাকরি করতাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তদারকিতে গিয়ে এক বাউলি (সুন্দরবনে মধু কাঠ গোলপাতা সংগ্রহকারী দলের পথপ্রদর্শক) এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বাদার হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মা বনবিবির নামে দীক্ষা নেওয়া মানুষ। জানিয়েছিলেন পশুপাখিদের ভাষা বুঝতে পারেন, বুঝতে পারেন তারা কী বলতে চাইছে; বেগোভূতেরা তাঁকে বাঘের অবস্থিতি সম্বন্ধে সতর্ক করে। তাঁকে অবিশ্বাস করিনি। আমার মত পেন্টুলপরা শহুরে মানুষ যদি অপরিচিত পথকুকুরের ডাক শুনে বুঝতে পারে সে বিরক্ত না ক্ষুধার্ত, তাহলে যে মানুষটি তাঁর সারা জীবনটি কাটালেন ম্যানগ্রোভের প্রকৃতিচর্চায় তিনি যে পশুপাখিদের ভাষা বুঝবেন এ আর আশ্চর্য কী! রেলচর্চার সূত্রে একবার এক বডিলিফটার (যারা রেললাইন থেকে কাটা পড়া মানুষের মৃতদেহ তুলে বাঁশে বেঁধে পলিথিনে জড়িয়ে জি.আর.পি.র কাছে জমা দেন) এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন একবার সোদপুরের কাছ থেকে এক দেহ তুলে তিনি ঝামেলায় পড়েছিলেন। সবকিছু চুকেবুকে যাওয়ার পরেও মৃত ব্যক্তিটি নাকি তাকে প্রায়ই বলতেন, অমন হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুললি বাবা, কোমরে বড্ড লাগল; এখনও ব্যথা আছে।

ভগবান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খুব একটা ভাব-ভালোবাসা নেই কারণ ভদ্রলোক আজ অবধি আমার কোন উপকারে

বড়লোক করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু বড়লোক হলে গলফ খেলতে হবে এই ভয়ে তিনি ওই প্রস্তাবে রাজি হননি। তবে ভূতেদের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ সৌহার্দ্য; তারা আমাকে নিঃসঙ্গতার সময় সঙ্গ দেয়, দুঃখের সময় সান্ত্বনা দেয়, বড়সাহেবের কাছে ঝাড় খেয়ে মন খারাপ হলে বলে, মন খারাপ করিস না, একদিন দেখবি গিয়ে ঠিক ওর ঘাড়টা মটকে দিয়ে আসবো। সবাই বলে কানাভুলো ভূতেরা পথিকের গন্তব্য ভুলিয়ে একই রাস্তায় বারবার ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে, ভয়ে ক্লান্তিতে একসময় পথিক মারা যায়। অথচ একবার গভীর রাতে ব্যাংককের রাস্তায় আমি যখন পথ হারিয়ে পেত্নী শাঁকচুন্নি চোরাচুন্নি মোহিনী শাকিনী ডাকিনী নিশি আলেয়াদের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, একটা কানাভুলো ভূতই আমার হাত ধরে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিল।

তবে পরিশীলনের দায় এনার ঘাড়েও চাপলো বলে। ভরসন্ধ্যা বেলায় ভূতের মন্দিরে এক স্বল্পবয়সী দম্পতিকে দেখে অবাক হলাম। বোঝাই যাচ্ছে তাঁরা এখানকার লোক নন। চা খেতে গিয়ে জানা গেল জোকা আই.আই.এম. সন্নিহিত এলাকায় অনেকগুলি বড় বড় আবাসন প্রকল্প হচ্ছে; তার একটিতে তাঁরা বাসস্থান ক্রয় করছেন। কতটা কাজ এগোল দেখতে এসেছেন। এবং সেখানে এলেই তাঁরা এখানে আসেন, পারিপার্শ্বিক তাঁদের এতটাই ভাল লাগে।

দ্বিতীয়টি আমতলা চৌমাথা থেকে পূর্বদিকে মউখালি বিবিরহাট সাজুয়া হয়ে হাটবাড়িয়ায়, চটা ডাকঘর রোডের উপর। এটি ছোটখাটো মন্দির। দুজায়গাতেই ফেরার পথে গিয়েছিলাম।

বড় কাছারি থেকে লস্করপুর ঘনশ্যামপুর ফতেপুর সরিষা হয়ে ডায়মন্ডহারবার ঠিক এক ঘণ্টা।

-৫-

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নিত্যযাত্রীরা জানেন, শরতের শুরুতেই কিভাবে হাতে এসে পড়তে থাকে রঙিন লিফলেট, সুন্দরবন ভ্রমণের। ক্যানিং টাউন থেকে লক্ষ্মীদা, ট্যারাদা, নিত্যদা প্রমুখেরা লঞ্চ নিয়ে পর্যটক নিয়ে বেরোন, সঙ্গে ইলিশ উৎসব। ভ্রমণের তিনদিনে তারা কোন কোন জায়গায় নিয়ে যাবেন সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা থাকে না, এই সব দাদারা কী কী দেখাবেন বলার চেয়ে বেশি জোর দেন কী কি খাওয়াবেন তার ওপর। ব্রোশিওরেই তিনদিনের চারবেলার মেনু ছাপিয়ে দেয়া থাকে। সকালের জলখাবারে একদিন লুচি, একদিন কচুরি; বিকেলে একদিন আলুর চপ মুড়ি, একদিন মোমো। তবে আমরা তো জানি, সত্যিকারের ইলিশ উৎসব পৃথিবীতে একজায়গাতেই হয়, ডায়মন্ডহারবারে। তবে কী না এ ইলিশ বেলচা ইলিশ, অর্থাৎ ট্রাক থেকে বেলচা দিয়ে নামাতে গিয়ে যে ইলিশ বেলচার ঘায়ে বিক্ষত হয়েছে; তাই দাম কম। ভরা বর্ষায়, রাস্তার ধারে, ডায়মন্ডহারবারে যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠে ভাতের হোটেল। তারা সবাই বেলচা ইলিশের পদ খাওয়ান - নেহাতই সাদামাটা চালের ভাত, সঙ্গে ইলিশের তেল, ভাপা, ঝাল, ঝোল, অম্বল মায় পাতুরি অবধি। এইরকমই এক ভোজনালয়ে বিলম্বিত মধ্যাহ্নভোজ।

এই জায়গার দেশীয় নাম হাজিপুর, চৈতন্যদেব পুরী গমনকালে হাজিপুরে এসেছিলেন। সেখান থেকে ছত্রভোগ বন্দর; আজকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর। বিপ্রদাস পিপলাই পঞ্চদশ শতকের কবি, মনসা-পাঁচালির প্রাচীনতম এবং সম্পূর্ণ কাহিনি একমাত্র তাঁর কাব্যেই লভ্য। সেখান থেকে এবং চৈতন্যজীবনীকাব্য থেকে আমরা জেনেছি নিম্ন গাঙ্গেয়বঙ্গের অন্যতম শক্তিপীঠ ছত্রভোগের কথা। বাঙালি সওদাগররা দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ও ভৈরব অম্বুলিঙ্গশিব দর্শন করে, চক্রতীর্থে স্নান করে সমুদ্রে নৌকায় বাণিজ্যে যেতেন। চৈতন্যদেব এই পথেই পুরী গিয়েছিলেই। শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখছেন 'এইমত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে। আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতুহলে'। পথে আদিগঙ্গার যে ঘাটে কিছু সময়ের জন্য থেমেছিলেন চৈতন্যদেব, এখন সেই স্থানেরই নাম 'বৈষ্ণবঘাটা'।

ডায়মন্ডহারবার, তার পুরনো হাজিপুর নাম নিয়ে সুন্দরবনের মধ্যে ভালোই ছিল। বাধ সাধল ইংরেজরা; নব্য শহর কলকাতা রক্ষার্থে নদীমুখে একটি বন্দর ও নদী বরাবর কিছু দুর্গ না বানালেই নয়। এখন পিকনিকের যে জায়গাটি রয়েছে, তার উজানেই চিংড়িখালি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ; কয়েকটা ভাঙা দেওয়াল, নদীতীরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ইটের টুকরো – দুর্গের একদা-বিস্তৃতি বোঝায়। জনশ্রুতি, সপ্তদশ শতকে পর্তুগিজ জলদস্যুরা লুটের মাল রাখার জন্য এটি তৈরি করে।

কিন্তু কাঁকনদিঘির জটার দেউল দেখেও পর্তুগিজ জলদস্যুদের কীর্তি বলেই মনে হয়েছে। পরবর্তীকালে ইংরেজরা এটি সারিয়েসুরিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করে, এবং অবশেষে নদীভাঙনে দুর্গটি পরিত্যক্ত হয়।

১৮১৫-র ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ার বলছে ইংরেজদের বাণিজ্যপোতগুলি এখানে মাল ওঠাতো নামাতো। বোঝা যাচ্ছে কলকাতা বন্দর চালু হবার আগে ডায়মন্ডহারবার বন্দর যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ডায়মন্ডহারবারে ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ স্টেশন স্থাপন থেকেই বোঝা যায় কলকাতার সঙ্গে ডায়মন্ডহারবারের যোগাযোগ সাহেবদের কাছে কতটা জরুরি ছিল। ডায়মন্ডহারবারে রেললাইন ও দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার তারাতলা থেকে লম্বা ডায়মন্ডহারবার রোড তারই অভিজ্ঞান। প্রয়োজনের তাগিদেই ডায়মন্ডহারবারে অনেক সরকারি অফিস গড়ে উঠেছিল, এমনকি একটি ছোট জেলখানাও।
১৮৬৮-৬৯ এ ডায়মন্ডহারবার বন্দরের মাইলখানেক দক্ষিণের এই দুর্গ পুনর্নির্মিত হয়। কলকাতা বন্দরের প্রতিষ্ঠা ১৮৭০ এ। পোতাশ্রয় গড়ে উঠতে ইংরেজরা এর নাম দিল ডায়মণ্ডহারবার, সেকি সূর্যাস্তকালে গঙ্গার জল হিরের মত চিকচিক করে বলে! শখানেক বছর আগেও এখানে জাহাজ থাকতো, মাল নামতো উঠতো। তবে এর কৌশলগত গুরুত্বও অনেকখানি। বাংলা থেকে বেরোতে গেলে তুমি যেই হও না কেন, এইখান দিয়েই তোমাকে বেরোতে হবে; চাঁদ সদাগর থেকে বেহুলা এই পথ দিয়েই গিয়েছিলেন; পর্তুগিজ থেকে ইংরেজ এই পথ দিয়েই এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই নদীপথকে উন্মুক্ত ও সচল রাখা ও এর উপর সার্বিক অধিকার বজায় রাখার প্রশ্নটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির কাছে চিরকাল গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। চল্লিশ বছর আগেও নদীতীরে চিংড়িখালি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে কলিকাতা নগরী রক্ষা করার জন্য দুর্গটি বানানো হয়েছিল, পাশেই ছিল ইংরেজদের একটি পুরাতন গোরস্থান। দুর্গ সুরক্ষিত করার জন্য ব্যারাকপুর থেকে কামান এনে বসানো হয়েছিল যার মধ্যে দুটি কামানের ভগ্নাবশেষ ২০১১ সাল নাগাদ পাওয়া গিয়েছিল। সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে বন্দর, ও তার সঙ্গে নুনের ব্যবসার স্বার্থরক্ষা; এই দুর্গ সেইসময়ে নিমক-রাজস্ব বিভাগের প্রধান অফিস ছিল। এছাড়াও মক্কা থেকে যেসব তীর্থযাত্রীরা ফিরতেন, তাদের জন্য একটা শিবির (কোয়ারান্টাইন ক্যাম্প) ছিল এখানে। বিগত চার দশকে নদীর পাড় ভাঙার দরুণ এই দুর্গ ক্রমিক অবলুপ্তির পথে, এখন সেখানে স্থানীয়রা বৎসরান্তিক বাতিল মাটির প্রতিমা বসিয়ে দিয়ে যায়।

নদীর ধারে, ভরা বর্ষার জোয়ার। নৌকারাজি, মাল নামছে উঠছে। জাহাজ আসছে যাচ্ছে, ঢেউ ভাঙছে, উল্টে ফেলে দেওয়ার মত প্রবল হাওয়া। বসে বসে খুব আশ্চর্য লাগছিল। একত্রিশ বছরের মার্গারিত এলিজাবেথ নোবল কুয়াশামোড়া এক শীতের সকালে জাহাজের ডেক থেকে স্বপ্নাবিষ্টের মত এখন আমি যেখানে বসে আছি এদিকেই হয়তো চেয়েছিলেন; ঠিক যেমনটি চেয়ে ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর বার্মাযাত্রাকালে; হয়তো তখনই তাঁর মনে এসেছিল 'কিতনা হ্যায় বদনসিব জাফর/ দফনকে লিয়ে দো গজ জমিনভি মিল নাহি সাকি।' - জাফর, তুমি এতই দুর্ভাগা, ভালবাসার দেশে তোমার কবরের জন্য দু'গজ মাটিও জুটল না। কিংবা 'উমর দরাজ মাঙ্গঁকে লায়ে থে চার দিন - দো আরজু মেঁ কাট গয়ে, দো ইন্তেজার মেঁ।' - চার দিনের আয়ু নিয়ে এসেছিলাম। দু'দিন কাটল প্রত্যাশায় আর দু'দিন অপেক্ষায়। উঠে পড়লাম; কিলোমিটারখানেক হেঁটে এলাম পুরনো কেল্লার দিক থেকে, মায়া রোড ধরে বাঁধ রোড, সেখান থেকে নদীর গা বরাবর রাস্তা চলে গেছে অ-নে-ক দূরে। নিচু মাঠে তখন গোড়ালি সমান জল, ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে কুচো মাছ। আকাশ সারাদিন রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল, এখন মেঘ জমছে। নৌকার রঙিন পাল গঙ্গায় পতপত করে উড়ছে।

সূর্য পাটের পথে, সদ্য অম্বুবাচী গেছে, দিন এখনও যথেষ্ট বড়। তবুও বাড়িফেরার তাড়া থাকেই, সেই কোন সকালে বেরিয়েছি, ইতিমধ্যে সারথিকে তিনবার ফোন হয়ে গেছে, সেও ফেরার তাড়া দিচ্ছে। রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে চা-ঘুগনি খেতে লেগেছি, দেখি একটা অটো আমাদের পেরিয়ে চলে গেল, আবার ঘুরে এসে আমার সামনে থামল। অটো

আপনি ডায়মণ্ডহারবারে এসেছেন আমাকে জানাননি। এইবারে ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম। অনেকদিন আগে যখন জিলা পরিষদে চাকরি করতাম, তখন এই ভদ্রলোক আমাদের কিছু ঘাট বাৎসরিক ভিত্তিতে জমা নিতেন। ওঁর বদান্যতা, এতগুলি বছর পরেও চিনেছেন ও অবসরপ্রাপ্ত আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়েছেন। আমি বললাম কী করে জানাবো, আমি কি আপনার ঠিকানা জানি! জানার দরকার নেই, ডায়মণ্ডহারবারে রাস্তার কুকুরকেও আমার নাম বললে আমার আড়ত দেখিয়ে দেবে। যাক বাবা! এঁর তাহলে আড়তও আছে, ভারি মজা।
গিয়ে উঠলাম নগেন্দ্রবাজারে তাঁর আড়তে। সে এক ভজখট কাণ্ড। সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, কেউ কারও কথা শুনছে না; শুনবে কি করে, মাছ নিলাম হচ্ছে তো! মাথায় ঝুড়িতে করে মাছ নিয়ে যাচ্ছে লোকে, ঝরঝর করে জল গড়াচ্ছে, আর সেই জল জামায় পড়তে এমন আঁশটে গন্ধ বেরোতে শুরু করল তা আর বলবার নয়।
বিকট ও বিচিত্রদর্শন সামুদ্রিক মাছের, চিংড়ির, কাঁকড়ার সমাহার। ফুট চার-পাঁচেকের বিশাল মুখগহ্বরের দৈত্যাকার মাছগুলোকে দেখে বিনীত প্রশ্ন করলাম, 'এই মাছ খায়?' 'অবশ্যই।' 'কারা খায়?' 'আজ্ঞে আপনারাই।' আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'কক্ষনো নয়। আমাদের বাড়িতে এইসব মাছ ঢোকেইনা।' তিনি বললেন 'আশি একশো টাকায় কি আর ক্যালকাটা ভেটকির ফিশ ফ্রাই হয়? ক্যালকাটা কেন, বোম্বে ভেটকিরও হয় না। তাহলে বাকি থাকলো কে, হাঙর আর এরা।' আমি পালাবার পথ খুঁজলাম। ভদ্রলোক জোরজার করে দুটো ইলিশ দিলেন। 'আরে নেন! এখন তো আর আপনি চাকরি করছেন না।' মাছ নিয়ে ডিকিতে, কারণ ফেরার পথে ছোট কাছারিগুলোয় ঢুকবো; বাঁওড়ের মেছো ভূতেরা মাছের জন্যে পাগল; রান্নাঘর বা জেলেদের নৌকা থেকেও তারা মাছ চুরি করে খায়। মাছ কিনে কেউ রাতের বেলা গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ফিরলে এরা তার পিছু নেয় – তারপর নির্জন বাঁশঝাড় বা বিলের ধারে ভয় দেখিয়েই হোক বা মারধোর করে মাছ নিয়ে নেয়। আর এতো ইলিশ বলে কথা!!

-৬-
তেমন কিছু ঘটেনি। ছোট কাছারিগুলো দেখে নির্বিঘ্নে বাড়িতে। পরদিন সকালে আবার বাজারে গিয়ে ইলিশগুলো কুটিয়ে আনতে হল।

- সমাপ্ত -

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূল ক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালের বাংলায় ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির প্রেরণা 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

টংলু টপ-এ দিনদুয়েক

অরুণাচল চ্যাটার্জী

ধোঁয়াওঠা গরম নুডল স্যুপের বাটিটা হাতে নিয়ে আমি আর মৈনাক বাইরে ঝলমলে রোদে এসে বসলাম। সামনে "শায়িত বুদ্ধ"-র পাহাড়গুলি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। একটা জামবাটি থেকেই দুজনে ভাগ করে খেয়ে নিচ্ছিলাম। সকাল সাড়ে দশটা বাজে, শোঁ শোঁ করে হাড়হিম করা বাতাস বইছিল, তাই চটপট খাবারের সদগতি করে ফেললাম। কথা হচ্ছিল, অনেকদিন পর শুধুমাত্র আমরা দুই বন্ধু আবার একসঙ্গে বেরোতে পারলাম, তাও বছর পনেরো হবে। তখন অনেক বিষয়েই আনকোরা ছিলাম, তা সত্ত্বেও সেইবারের বেড়ানোর অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চে ভরপুর ছিল। তবে সে গল্প এখানে করছি না, অন্য কোনও লেখায় তা প্রকাশ করব।

কাজের কোনো বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলাম মৈনাকের সঙ্গে, হঠাৎ করেই পরিকল্পনা হল, কোথাও একটু হেঁটে এলে হয়না! এ হাঁটা লেকের পাশে হেঁটে আসা নয় বা বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে গড়িয়াহাটও নয়। প্ল্যান হল হিমালয়ের কোলে চড়াই উৎরাইয়ে খুব কম দিনে কোথাও একটু হেঁটে আসা। ফেব্রুয়ারি মাসেই যাওয়া হবে ঠিক হল। তার মানে যেখানেই যাইনা কেন ঠাণ্ডা ভালোই পাব, সঙ্গে উপরি পাওনা তুষারপাতও জুটে যেতে পারে। ঠিক হল মানেভঞ্জন থেকে ধোতরে হয়ে টংলু, আর সেখান থেকে সরাসরি নেমে আসা হবে মানেভঞ্জনে, অন্য রাস্তা দিয়ে।
সরাইঘাট এক্সপ্রেসে করে মাঝরাতে নিউ জলপাইগুড়িতে পৌছালাম। পরের দিনের পুরোটাই হাতে থাকবে, এই ভেবেই এই ট্রেনটি বেছে নিয়েছিলাম। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি খুবই ভালো, আগে থেকে বুক করা থাকলে রাত্রে থাকার ঘর বা ডর্মেটরির বেড পেতে অসুবিধা হয়না। আমাদের বুকিং না থাকায় ঘর পাব কিনা চিন্তা ছিল, তবে ডর্মেটরির একটা বেড ফাঁকা পাওয়া গেল, কিন্তু কেয়ারটেকার কিছুতেই একটা বেড দুজনের জন্য দিতে নারাজ। আমরা যতই বলি কয়েক ঘন্টার তো ব্যাপার, ভোর হলেই বেরিয়ে পড়ব, আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে কোনো অসুবিধা হবে না, তা সে নাছোড়বান্দা। এসব কথা বলার ব্যাপারে আমি বেশি নাক গলাইনা, জানি চিঁড়ে যদি ভেজে তবে মৈনাকের কথাতেই ভিজবে। অবশেষে তাকে রাজি করানো গেল।
ভোর হতেই প্রথম আলোয় ডর্মেটরির জানালা দিয়েই কাঞ্চনজঙ্ঘার কিছু অংশ আবছা দেখা গেল। আমরা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডের দিকে, সেখান থেকে শেয়ার জীপে করে রওনা দিলাম দার্জিলিং-এর দিকে। সরাসরি যাবার কোনও গাড়ি পেলাম না। আবহাওয়া বেশ ভালোই ছিল।
ঘুম থেকে একটা মারুতি ভ্যান বুক করে চললাম মানেভঞ্জনের উদ্দেশ্যে। খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। ফলে হাতে অনেকটা সময় পেলাম। দুপুরের খাবারটা নানারকম মোমো দিয়ে সারলাম। এবার ধোতরের দিকে রওয়ানা দেবার পালা, কিন্তু কোনও শেয়ারের জীপ পাওয়া যাচ্ছেনা, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ঠিক করলাম যে, গাড়ি বুক করেই এগোতে হবে নইলে বাকি দিনটা নষ্ট হবে। ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ি বাঁক পেরিয়ে অবশেষে ধোতরেতে নামলাম, রাস্তা বেশ খারাপ ছিল, পৌঁছাতে দুটো বেজে গেল।

এখান থেকে টংলু প্রায় চারঘন্টার হাঁটা রাস্তা, এই হিসাব অবশ্যই আমাদের, পাহাড়িরা এর অর্ধেকেরও কম সময়ে হয়তো পৌঁছে যাবে। পুরোটাই হালকা চড়াই, কখনও ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার কখনও গাছবিহীন ঘাসজমির মধ্যে দিয়ে চলেছে এই পায়ে হাঁটা রাস্তা। পিঠের বোঝা খুবই হালকা ছিল, তাই চড়াই ভাঙতে বড় একটা কষ্ট হচ্ছিল না। কিছুটা এগোতেই একটা বড় মাঠ, হয়তো স্থানীয়দের খেলার জন্যই। সেটা পেরিয়ে একেবারে জঙ্গুলে মেঠো রাস্তায় এসে পড়া। চারিদিকে বরফ পড়ে রয়েছে। অবশ্য রাস্তা বলে যাকে ভাবছি, সে তো বরফের তলায়। শুধু সরু ফালির মতো যে অংশটায় কোনো গাছপালা নেই, সেটাকেই রাস্তা ভেবে এগিয়ে যাচ্ছি দুজনে। মাঝে মধ্যে বরফের ওপর কিছু গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীদের পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। শহুরে জীবনযাত্রা থেকে এসে হঠাৎ করেই চড়াই ভাঙতে প্রথমে বেশ কষ্ট হয়, তবে খানিক হাঁটার পর তা ঠিকও হয়ে যায়। পথের কিছু জায়গায় পাথর বসিয়ে রাস্তার মতো করা আছে, কিছুটা পর পর নালার মতো কাটা। এই রাস্তার মতো অংশ দিয়ে বরফ গলে যখন জলের স্রোত নিচের দিকে নামতে থাকে তখন এই আড়াআড়ি নালাগুলো কাজে লাগে।

চারিদিকের পরিবেশ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে দু-এক দিন আগেই বরফ পড়েছে। গাছের পাতার ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে ভর্তি, দেখতে বেশ লাগে। দিন শেষ হতে এখনও কয়েক ঘন্টা বাকি, পড়ন্ত রোদ ঝুরো বরফে পড়ে অপরূপ দেখাচ্ছে। কোথাও কোথাও তাজা বরফের মধ্যে পা অনেকটাই ঢুকে যাচ্ছে, এবড়োখেবড়ো রাস্তা প্রায় সমান দেখাচ্ছে বরফ পড়ার জন্য। মাঝে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম, সঙ্গে শুকনো খাবার ছিল, সেসব টুকটাক মুখে পুরলাম। শুনশান চারিদিক, শুধু তাজা বরফে পা ফেলার আওয়াজ। বরফের ওপর কিছু শাকাহারী বন্যপ্রাণীদের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল, হয়তো কোনও

এপথে আমরা দুজনেই নতুন নই। সামনের একটা প্রায় সমতল অংশ পেরিয়ে ওই পাহাড়ের মাথায় উঠতে হবে। সমতল জায়গাটায় পাথর বসিয়ে একটা রাস্তামতো করা আছে, রাস্তার দুপাশে কিছু কাঁটা ঝোপ, পড়ে থাকা বরফে প্রায় আয়তাকার কিছু পায়ের ছাপ চোখে পড়ল, যার সামনের দিকে নখরের ছাপও স্পষ্ট, ভাল্লুকের পায়ের ছাপ বলেই মনে হল। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সেই দিকেই পায়ের ছাপটা এগিয়ে গেছে বলে আন্দাজ করছিলাম, শেষে আর বরফ না থাকায় বা থাকলেও গলে যাওয়ায় প্রাণীটি যে কোন অভিমুখে এগিয়েছিল তা আর বোঝার উপায় রইল না।

আমরা এই আরামের সমতল রাস্তাটি পেরিয়ে সামনের চড়াই এর জন্য তৈরি। পাহাড়ের গা দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ রয়েছে মনে হল, তবে তা স্থানীয়দের ব্যবহারেই যে হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়, কিছু মেষপালকও এই পথেই নেমে আসে ধোতরের দিকের পাহাড়ি ঢালে ও পাহাড়ি ধাপে গবাদি পশু চরাতে। সূর্য মেঘের আড়ালে, ভ্যালি ক্লাউড-এর আনাগোনা শুরু হয়েছে, মনে হল এরপর হাওয়ার দাপট বাড়তে পারে, সঙ্গে বৃষ্টি বা তুষারপাত। চড়াই ভাঙা শুরু করতেই তাই হল, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রায় জমে যাওয়ার উপক্রম। দুজনেই ঠিক করলাম আর এঁকেবেঁকে না গিয়ে সোজা উঠে পড়ব, তাতে কিছুটা তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারব। কিন্তু মাঝে মধ্যেই দাঁড়াতে হচ্ছিল। বেশ হাঁপিয়ে উঠছিলাম। ঠাণ্ডা শুষ্ক হওয়ার দাপট ক্রমেই বেড়ে চলল, সামনের কিছুই যে আর দেখা যায় না। মৈনাক আমার আগেই ছিল, তবে বেশ কিছুক্ষণ ওকে দেখতে পাচ্ছিনা। ভ্যালি ক্লাউডে চারিদিক ঢাকা। শুধু দিক ঠিক রেখে উঠে চলেছি। ঘন্টাখানেকের মধ্যে চড়াই ভেঙে উঠে এলাম বাঁধানো রাস্তায়। কিন্তু সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে কিছুই ঠাওর করতে পারছিনা। এক ফুট দূরের কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

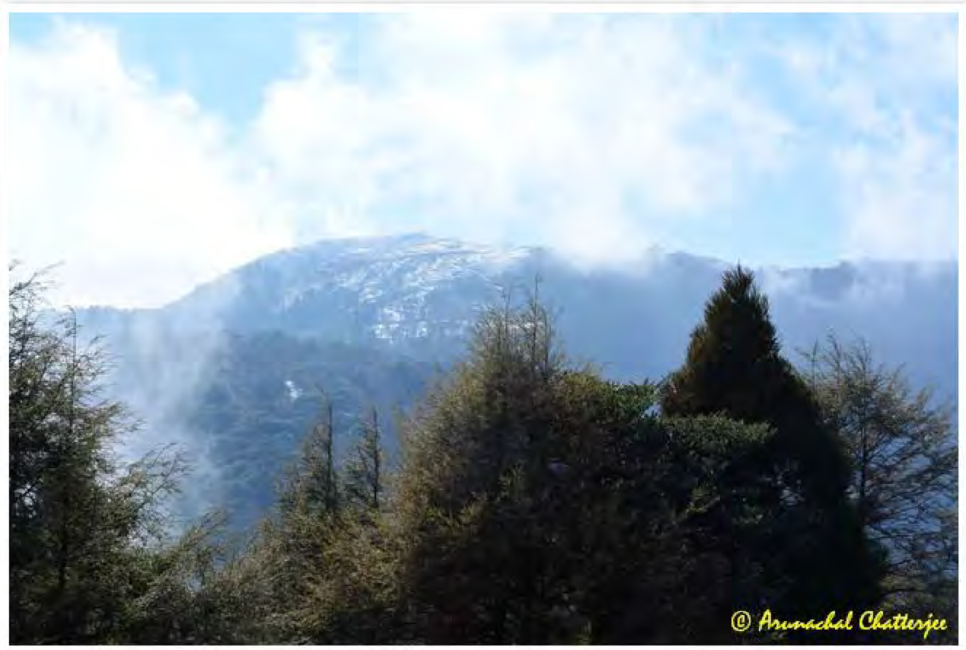

"উঠেছিস?" মৈনাকের চিৎকারে বুঝলাম ও রাস্তার ওপরেই আছে কোথাও। হোয়াইট-আউট যাকে বলে আর কী! অনেকটা তুষার ঝড়ের মতো হয়ে চলেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া মুখের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছে। মধ্যে মধ্যে ভ্যালি ক্লাউড কিছুটা হালকা হয়ে যাওয়ায় একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তা ধরে কিছু এগিয়ে বাঁদিকে একটা টেন্ট আর কটেজ চোখে পড়ল। তার মানে আরো কিছুটা গেলে জিটিএ লজ, সেটা পেরিয়ে একটা ট্রেকার্স হাট আছে, সেখানেই আমাদের রাত্রিবাসের পরিকল্পনা। এই লজ বা হাট দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডি জি এইচ সি)-এর মাধ্যমে বুক করা যায়। বুকিং তো করে আসিনি, তবে সপ্তাহের মাঝে, এই সময় পর্যটকদের অত ভিড় থাকে না, তাই কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই বেরিয়েছিলাম। কনকনে হাওয়ার মধ্যে মনে হচ্ছে সেই ট্রেকার্স হাট আগে খুঁজে বার করি, তারপর গিয়েই গরম গরম কিছু পেটে চালান করতে হবে, নইলে জমেই যাব। চারিদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, আবছা আবছা যা দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যেই খুঁজে বার করতে হবে। মৈনাকই দেখে জানান দিল যে পাওয়া গেছে থাকার জায়গাটা। টংলুর ট্রেকার্স হাট-এর বেড়া টপকে সোজা ওদের খাবারের জায়গায়। রাতে শোয়ার জায়গা পাব কিনা তা পরে দেখা যাবে, আগে খাবার অর্ডার করতে হবে। চা আর কিছু খাবার তৈরি করতে বলার পর দাজুকে জিজ্ঞাসা করা হল, থাকার কী ব্যবস্থা হতে পারে। বলল, একটা চারজনের থাকার ঘর ফাঁকা আছে, বুকিংও নেই, দুজনের থাকার ভাড়াই দিতে হবে, তবে কোনও পর্যটক চলে এলে রুম শেয়ার করতে হবে। এতে তো অসুবিধার কারণই নেই, খাবার করতে যতক্ষণ লাগবে ততক্ষণে আমরা রুকস্যাকগুলো রেখে আসব ঠিক করলাম। দাজু আমাদের জন্য একটা ঘর খুলে দিল। ঘরের অবস্থা আর ব্যবস্থা দেখে যারপরনাই খুশি হলাম। কাঠের মেঝে। চারটে আলাদা খাট। প্রত্যেকটি খাটে গদিসহ বালিশ আর দুটো করে গায়ে দেওয়ার লেপ রাখা আছে। ঘরের উত্তরদিকের দেওয়ালে বড় কাঁচের জানালা, অর্থাৎ দিনের আলো ফুটলেই "শায়িত বুদ্ধ"- এর দেখা মিলবে ঘর থেকেই। বাথরুম চারটে আলাদা, সবার ব্যবহারের জন্য। বাথরুমের বাইরে বড় বড় ড্রামে জল রাখা আছে। একটু ফ্রেশ হয়ে চলে এলাম খাবার জায়গায়। মেঘাছন্ন পরিবেশে চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে গিয়েছে। খাবার ঘরের আলোটাই যা জ্বলছে। খাবার জায়গাটির লাগোয়া ঘরগুলিতে দাজু তার পরিবার নিয়ে থাকেন। খাবারের জায়গায় কয়েকটি টেবিল আর চেয়ার রয়েছে। দুদিকের দেওয়ালের তাকে নানারকমের বাসনপত্র। একদিকে আবার কাচের আলমারির মধ্যে বাসন সাজানো রয়েছে। পাহাড়িদের এইভাবেই খাওয়ার ঘর সাজানোর রেওয়াজ। তার পাশেই সন্ধ্যেবেলা দাজুর ভাই কাঠের আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে আগুন পোয়ানোর জন্য। সবে মাত্র সে ফিরেছে পাহাড়ের নিচের দিকের জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে। আগুনের পাশে আমি আর মৈনাক বসে পড়লাম ওদের সঙ্গেই। গরম চা চলে এল। জিজ্ঞাসা করছিলাম, এখন আবহাওয়া কেমন চলছে, কাল কী হতে পারে ইত্যাদি। নানা কথার মধ্যেই রাতের খাবার পরিবেশন করে দিল টেবিলে। বাকি রুমের কয়েকজন পর্যটকও ডিনারের জন্য উপস্থিত। হাড়কাঁপুনি ঠাণ্ডায় গরম ভাত, ডাল, আলুভাজার যে কী মহিমা, তা যারা যারা উপভোগ করেছেন, উপলব্ধি করতে পারবেন।

হাওয়ার বেগ বিকেলের মতো না হলেও এই রাতেও বেশ জোরেই বইছে। আকাশ একটু পরিষ্কার লাগছে, ভ্যালি ক্লাউডও আর নেই। তাই তাপমাত্রাও ক্রমশ যে নিচের দিকে নামছে তা খানিকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ টের পেলাম। ভাবছিলাম আকাশের আলোয় যদি একবার তুষারধবল শৃঙ্গরাজি দেখা যায়। কেমন দেখতে লাগে এই সময়, তার অভিজ্ঞতা আছে, তবুও এ দৃশ্য কখনোই পুরোনো হয়না। বেশিক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না বাইরে। ঠাণ্ডার বহর দেখে দুজনেই খাটের ওপর স্লিপিং ব্যাগ খুলে তার ভিতরে ঢুকে পড়লাম, তার ওপর চাপা দিলাম বাকি যে সাজসজ্জা রাখা ছিল তাই দিয়ে। খুব ঠাণ্ডায় ঘুম আসতে দেরি হয়, বিশেষতঃ পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে। মৈনাককে দেখলাম, মোমবাতি জ্বালিয়েছে। একটা বই বার করেছে পড়বে বলে। আর আমি মাথা থেকে পা, পুরোটাই ঢুকে পড়েছি স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কিছু শব্দে, হাওয়ার জন্য বোধহয় কোনোকিছু উড়ে এসে পড়েছে বাইরে। এরপর ঘুম ভাঙল একেবারে ভোরে, পাঁচটার পর। উত্তরের কাঁচের জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম, আবহাওয়া পরিষ্কার, হওয়ার দাপটও কম মনে হচ্ছে। কাঁচের বাইরের একদিকে গুঁড়ো বরফের আস্তরণ পড়ে গেছে। আবছা আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার

পাহাড়গুলো মেঘের সমুদ্রে ডুবে আছে। মনে হবে সামনের সেই সুবিশাল সাদা মেঘের সমুদ্র পেরোলেই "শায়িত বুদ্ধ"-এর পাহাড় ছুঁতে পারব।
পূর্বদিকে তখনও সূর্যের লাল আভা দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে, পূর্বদিকের পাহাড়ের, মানে ডানদিকের, যেদিকে ভুটানের শৃঙ্গরাজিগুলি দেখা যায়, সেদিকের আকাশ রক্তিম আভায় ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে "শায়িত বুদ্ধের" শৃঙ্গগুলিকে একে একে সেই লালাভ আলোয় রাঙিয়ে তুলল। তুষারাবৃত পাহাড় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ রং বদলাতে বদলাতে হলুদ রঙের হয়ে গেল। তখন মনে হচ্ছিল যেন সোনার পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে। কী অপরূপ শোভা! বারংবার দেখেও নতুন করে দেখার আকুতি থেকে যায়।

ঝলমলে রোদে বসে, সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে, ব্রেকফাস্টের গরম নুডল স্যুপের বাটি থেকে ভাগ করে খেতে খেতে আমাদের নানা রকম আলোচনা হচ্ছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল একযুগেরও বেশি সময় আগে এইখানেই একবার একটা ক্যাম্প করতে এসেছিলাম। সেই সব কথাবার্তার মধ্যেই প্ল্যান হল, পাহাড়ের যে ঢালগুলোয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ করেছিলাম, সেই সব জায়গায় আর একবার ঘুরে এলে কেমন হয়, তারপর সেখান থেকে নাহয় তুমলিং ঘুরে আসা যাবে।
মানেভঞ্জন থেকে গাড়িতে করে পিচরাস্তা ও ঢালাইরাস্তা দিয়ে সরাসরি এখানে আসা যায়, আর সেই রাস্তাই তুমলিং হয়ে সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত সান্দাকফু অবধি চলে গেছে। তবে সেইসব রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত অনুমতিপত্র লাগে। সান্দাকফু ট্রেকেও অনুমতির প্রয়োজন হয়।

কাল রাতে ভালোই তুষারপাত হয়েছে, আগের রাতেও নাকি পড়েছিল। চারিদিক সাদা। ছোট ছোট টিলার ওপর উঠতে গিয়ে প্রায় হাঁটু অবধি বরফে ঢুকে যাচ্ছিল। টিলার মাথা থেকে আশেপাশে যতটা দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ি ঢালগুলো সাদা

ঢেউ খেলে তুমলিং পৌঁছে গেছে। টিলাগুলোর ওপর থেকে দেখলাম রাস্তাগুলোও বরফে ভর্তি, আগের দিনের বরফের সঙ্গে কাল রাতের নতুন বরফ পড়েছে। রাস্তা দিয়ে কিছু এগিয়ে আর একটা টিলার ওপর উঠে বাঁদিকে দূরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট। টংলু থেকে এভারেস্ট এবং চতুর্থ ও পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গদুটিও দেখা যায় আবহাওয়া ভালো থাকলে। দেখা গেল এভারেস্ট, তবে তার থেকেও একটু বেশি পরিষ্কার দেখা গেল সেই লোৎসে আর মাকালুকে।

রাস্তার বরফে দুটি সমান্তরাল সরু নালার মতো তৈরি হয়েছে, ল্যান্ডরোভারের চাকার চাপে। সূর্যের তাপে বরফ কোথাও কোথাও গলতে শুরু করেছে। ফলে জমাটবাঁধা বরফগুলো পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে, হাঁটতে গিয়ে প্রায়ই পা হড়কাচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে আমরা টংলুর বাঁদিকের পাহাড়ি ঢালে চলে এলাম। একটু আগে যে সাদা পাতলা বরফের আস্তরণ দেখা যাচ্ছিল এই ঢাল বেয়ে, এখন তা সব প্রায় গলে গেছে রোদের জন্য।
এই ঘাসে আবৃত ঢালে কোনও বড় গাছ নেই, কিছু গুল্মজাতীয় গাছপালা, তার মধ্যে কাঁটাওলা গাছের দেখাই বেশি মেলে। গল্প করতে করতে ঢাল বরাবর নেমে প্রায় তুমলিংয়ের কাছে গিয়ে উঠলাম রাস্তায়। ছোট্ট জনপদ তুমলিং, টংলুর থেকে কম উচ্চতায় অবস্থিত। অনেক হোমস্টে ও ট্রেকার্স হাট হয়েছে পর্যটকদের জন্য, এটাই এদের একমাত্র উপার্জনের রাস্তা। এরকমই একটা হোটেলে দুপুরের বিরতি।

দুপুরের খাবার খেয়ে আরও কিছুটা এগোলাম সান্দাকফু যাওয়ার রাস্তায়, বেশি এগোনো যাবেনা, কারণ তার জন্য বিশেষ

জনবসতি চোখে পড়ল। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এদিকওদিক ঘুরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আরও ঘন্টাখানেক কাটিয়ে দিলাম।
এবার ফেরার পালা। তুমলিং এর পাশ দিয়ে ফেরার সময় দেখলাম, আগের থেকে গাড়ির সংখ্যা বেড়ে গেছে। আমরা ঢালাই রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে ফিরে চললাম টংলু টপের দিকে। দুপুরের পর থেকে ভ্যালি ক্লাউড এর আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গগুলো মাঝে মধ্যেই ঢাকা পরে যাচ্ছে মেঘের পাতলা আস্তরণে। টংলু ট্রেকার্স হাটের পাশের একটা উঁচুমতো অংশে গিয়ে বসলাম। সূর্যাস্ত দেখার অপেক্ষায়। সকালেই এই জায়গাগুলো বরফে ঢাকা ছিল, এখন বরফহীন ঘাসজমি। আমাদের সামনে, অর্থাৎ উত্তরের দিকে সিঙ্গালিলা রেঞ্জ-এর পর্বতমালা, আর পিছনের দিকে পাহাড়ি ঢাল নেমে গিয়েছে মেঘমা ও চিত্রে-এর দিকে। বিকেলের দিকে, সেই পাশেই মেঘের ঢেউ এসে গোটা পাহাড়ি ঢালটাকে ঢেকে ফেলল মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। উঁচু পাহাড় আর টিলাগুলোর মাঝে মেঘের সমুদ্র, নিচের কোনোকিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ঢালের গা বেয়ে ওপরে উঠে মেঘগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নানা দিকে। মেঘের সমুদ্রের ওপরে সূর্যাস্তের আলো পড়ে রঙিন করে তুলছে। সূর্য একটু একটু করে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আলোর ছটা ক্রমশ বর্ণ পরিবর্তন করে চলেছে হালকা গোলাপি থেকে হালকা লাল, কমলা ইত্যাদি রঙে। মেঘের রঙও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। শান্ত পরিবেশে এই খেলা দেখে চলেছি মন্ত্রমুগ্ধের মতো। উত্তরের শৃঙ্গরাজিও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রঙের খেলায়।

আজ মনে হচ্ছে রাতের দিকে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক। আকাশের তারারা পরিস্ফুট হচ্ছে ক্রমশ। মনে হচ্ছে এইখানেই শুয়ে বসে গল্প করে কাটিয়ে দিই। ঠাণ্ডার সেঁক পেয়ে উঠে পড়তে হল অগত্যা। টিলার ওপর থেকেই দেখেছিলাম, আমাদের ট্রেকার্স হাটের সামনে তিনটে এসইউভি ধরণের গাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে, মানে কিছু পর্যটকের আগমন হয়েছে নিশ্চয়। ফিরে গিয়ে দেখলাম, দাজু দুটো খাট আর বিছানা সরিয়ে নিয়ে গেছে অন্য ঘরে। বলল, একই পরিবারের তাই একঘরেই থাকবে বলছিল, সেজন্য খাটই শিফট করে দিলাম। মানে আমরা দুজনেই থাকব এঘরে। খাওয়ার ঘরে গিয়ে বসলাম, আগুনের কাছে। দেখলাম আজ নানান রান্নার প্রস্তুতি চলছে। অনেকের খাবার তৈরি করতে হবে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শুকনো খাবার আর গরম গরম চা খেতে খেতে দাজুর পরিবারের কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা চলছিল। হিন্দিতেই কথা বলছিলাম। ওখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, পর্যটন শিল্প এসব নিয়ে অনেক কিছু জানা গেল। কষ্টের, অসচ্ছলতার জীবন, তবু নরম মনের অধিকারী ওরা। ওদের ব্যবহার আপনাকে বার বার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এই হিমালয়ের কোলগুলিতে।
রাতের ঝকঝকে আকাশে অগুনতি তারাদের সমাবেশ। একটু মন দিয়ে খেয়াল করলে হয়তো কিছু উল্কাও চোখে পড়বে। সিঙ্গালিলা রিজ-এর "শায়িত বুদ্ধ"-এর পর্বতমালা এখনও দেখা যাচ্ছে, রাতের আকাশের আবছা আলোয়। বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায়না। কনকনে ঠাণ্ডায় শরীর জমে যাচ্ছে। তবুও এই দৃশ্যের এক কণাও যেন ছাড়া যায়না। আবার কবে এ দৃশ্য দেখতে পাব তার তো ঠিক নেই। কালই নেমে যেতে হবে যে।
খুব ভোর ভোর উঠে পড়লাম, কাল যে টিলার ওপর বসেছিলাম বিকেল বেলায়, সেখানেই আবার গেলাম। ভোরের আলোয় ভুটান, নেপাল, ভারতের পর্বতমালা পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়াশা বাড়তে থাকে তখন আর দূরের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি দেখা যায়না। "শায়িত বুদ্ধ"-র যে শৃঙ্গগুলি পর পর দেখা যায় বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে (মাথার দিক থেকে পা-এর দিকে), সেগুলি হল জানু, কুম্ভকর্ণ-এর দুটি শৃঙ্গ, কাংবাচেন, কোকতাং, রাথঙ, কাবরু গ্রুপের শৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, গোচা, পান্ডিম ও তিনছেন খাং। এই শৃঙ্গগুলোই এক এক জায়গা থেকে একেক রকম দেখতে লাগে। সান্দাকফু থেকেও খুব সুন্দর দেখা যায় এই শৃঙ্গগুলো।
টিলার ওপর থেকে ধোতরের দিকের রাস্তাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। তবে আমরা সেদিক দিয়ে নামবো না। ফিরবো মেঘমা হয়ে, চিত্রে দিয়ে মানেভঞ্জন।

আজ মনে হচ্ছে রাতের দিকে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক। আকাশের তারারা পরিস্ফুট হচ্ছে ক্রমশ। মনে হচ্ছে এইখানেই শুয়ে বসে গল্প করে কাটিয়ে দিই। ঠাণ্ডার সেঁক পেয়ে উঠে পড়তে হল অগত্যা। টিলার ওপর থেকেই দেখেছিলাম, আমাদের ট্রেকার্স হাটের সামনে তিনটে এসইউভি ধরণের গাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে, মানে কিছু পর্যটকের আগমন হয়েছে নিশ্চয়। ফিরে গিয়ে দেখলাম, দাজু দুটো খাট আর বিছানা সরিয়ে নিয়ে গেছে অন্য ঘরে। বলল, একই পরিবারের তাই একঘরেই থাকবে বলছিল, সেজন্য খাটই শিফট করে দিলাম। মানে আমরা দুজনেই থাকব এঘরে। খাওয়ার ঘরে গিয়ে বসলাম, আগুনের কাছে। দেখলাম আজ নানান রান্নার প্রস্তুতি চলছে। অনেকের খাবার তৈরি করতে হবে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শুকনো খাবার আর গরম গরম চা খেতে খেতে দাজুর পরিবারের কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা চলছিল। হিন্দিতেই কথা বলছিলাম। ওখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, পর্যটন শিল্প এসব নিয়ে অনেক কিছু জানা গেল। কষ্টের, অসচ্ছলতার জীবন, তবু নরম মনের অধিকারী ওরা। ওদের ব্যবহার আপনাকে বার বার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এই হিমালয়ের কোলগুলিতে।

রাতের ঝকঝকে আকাশে অগুনতি তারাদের সমাবেশ। একটু মন দিয়ে খেয়াল করলে হয়তো কিছু উল্কাও চোখে পড়বে। সিঙ্গালিলা রিজ-এর "শায়িত বুদ্ধ"-এর পর্বতমালা এখনও দেখা যাচ্ছে, রাতের আকাশের আবছা আলোয়। বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায়না। কনকনে ঠাণ্ডায় শরীর জমে যাচ্ছে। তবুও এই দৃশ্যের এক কণাও যেন ছাড়া যায়না। আবার কবে এ দৃশ্য দেখতে পাব তার তো ঠিক নেই। কালই নেমে যেতে হবে যে।

খুব ভোর ভোর উঠে পড়লাম, কাল যে টিলার ওপর বসেছিলাম বিকেল বেলায়, সেখানেই আবার গেলাম। ভোরের আলোয় ভুটান, নেপাল, ভারতের পর্বতমালা পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়াশা বাড়তে থাকে তখন আর দূরের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি দেখা যায়না। "শায়িত বুদ্ধা"-র যে শৃঙ্গগুলি পর পর দেখা যায় বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে (মাথার দিক থেকে পা-এর দিকে), সেগুলি হল জানু, কুম্ভকর্ণ-এর দুটি শৃঙ্গ, কাংবাচেন, কোকতাং, রাথঙ, কাবরু গ্রুপের শৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, গোচা, পান্ডিম ও তিনছেন খাং। এই শৃঙ্গগুলোই এক এক জায়গা থেকে একেক রকম দেখতে লাগে। সান্দাকফু থেকেও খুব সুন্দর দেখা যায় এই শৃঙ্গগুলো।

টিলার ওপর থেকে ধোতরের দিকের রাস্তাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। তবে আমরা সেদিক দিয়ে নামবো না। ফিরবো মেঘমা হয়ে, চিত্রে দিয়ে মানেভঞ্জন।

ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা দিয়ে না হেঁটে, সরাসরি পাহাড়ি ঢাল দিয়ে নামতে শুরু করলাম, পথ সংক্ষেপ করার জন্য আর কী! টংলু তুমলিং ছেড়ে ঠিক তার নিচের একটি গ্রাম মেঘমা, তার উদ্দেশ্যে। নামার পথে একটা জায়গায় অনেকগুলো শকুন দেখলাম, হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে এদের বাস। মেঘমা অবধি কোনও বড় গাছ প্রায় নেই। আরও কিছুটা এগোতে ওপর থেকে মেঘমা গ্রাম চোখে পড়ল। গ্রামটিতে খুব বেশি লোকের বাস যে নেই তা বোঝা যায়। তবে একটা সুন্দর মনাস্ট্রি আছে। আর আছে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর বর্ডার আউটপোস্ট। মেঘমা নেপাল সীমান্তে অবস্থিত, তাই এই বন্দোবস্ত। সুতরাং এই চেকপোস্টে এরা ইচ্ছে করলেই ব্যাগ তল্লাশি করে দেখতে পারে। এই অঞ্চলে ছবি তোলাও নিষেধ। নিস্তব্ধ মেঘমা পেরিয়ে বড় বড় গাছের দেখা পেলাম।

উচ্চতা কিছুটা কম, হাওয়ার দাপট কম, তাই বড় গুল্ম এবং বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের দেখা মেলে। উল্লেখযোগ্য গাছের মধ্যে আছে রডোডেনড্রন। ফেব্রুয়ারির শেষের দিক, এখন রডোডেনড্রন ফুলের সময় নয়। তবে কিছু কিছু গাছে দেখলাম নানা রঙের রডোডেনড্রন ফুল ফুটতে শুরু করেছে। এই ফুলগুলি স্থানীয়ভাবে গুরাস বা বুরাস নামেও পরিচিত। বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটে। একরঙা বা ছিটযুক্ত হতে পারে। এই ফুলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এই ফুলের রস। অত্যন্ত উপাদেয় পানীয়ও তৈরি হয় বুরাস-এর রস থেকে।

একচোটে অনেকটা নেমে এসেছি, তাই মেঘমা পেরিয়ে ভাবছিলাম কোথায় একটু বিশ্রাম নেওয়া যায় আর খাওয়াদাওয়াও করা যায়। মেঘমা থেকে আর একটু নিচের দিকে নামলে ছোট্ট একটা চটি আছে, জায়গাটার নাম লামাধুরা। ছেলেটি মৈনাককে দেখেই চিনতে পারল। আগেরবার যখন এসেছিল তখন আলাপ হয়েছিল। যাক একটু বিশ্রাম নেওয়া যাবে এইখানে। পিঠের স্যাক নামিয়ে কাঠের বেঞ্চে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম আর মৈনাক ওদের পোষ্যটিকে নিয়ে মেতে উঠল। তবে তার মধ্যে খাবার বলে দেওয়া হলো, ম্যাগি আর চা। ঘন্টাখানেক এখানে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এবার সামনে পাব পাহাড়ি গ্রাম চিত্রে। এখানে অনেক লোকের বাস। তারপর সরাসরি মানেভঞ্জন। চিত্রে অবধি পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা রয়েছে হাঁটার। এরপর পায়ে হাঁটার রাস্তা বলতে শুধু ঢালু ও খাড়া সিঁড়ির ধাপ। তার পাশ দিয়ে পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে নেমে গেছে মানেভঞ্জন। আর এই রাস্তাই ওপরের দিকে পোঁছে গেছে টংলু টপ-এ। পিচ রাস্তা ধরে হাঁটলে রাস্তা দীর্ঘায়িত হবে, সেই ভেবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে করা সিঁড়ির পথই বেছে নিলাম। স্থানীয় ভাষায় এই ধরণের সর্টকাট চোরবাটো বলে পরিচিত। ক্রমাগত ঢালু ও খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিরক্তি ধরে যাবে। খালি মনে হবে কতক্ষণে এর শেষ! ঘন্টাখানেক এভাবে যাবার পর প্রায় লোকালয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে গলিঘুঁজির মধ্যে দিয়ে নেমে এলাম মানেভঞ্জনে। সিঁড়িপথের শেষে একটা সাইনবোর্ড আছে রাস্তার পাশে, পিছন ফিরে দেখলাম তাতে লেখা আছে - "ইউ আর ওয়েলকাম টু নেপাল"।

চোরবাটো নামতে গিয়ে তার মানে কি আমরা নেপালের গ্রামের মধ্যে দিয়ে এলাম শেষ ঘন্টাখানেক! সেটা বিস্ময়ই থেকে গেল। সেই বিস্ময় নিয়েই শেষ হল এবারের যাত্রা। শেষ হল এই আশা নিয়ে যে, আবার এভাবে হাঁটতে বেরোব কোনও এক হিমালয়ের কোল বেয়ে সর্পিলাকার মেঠোপথে।

অধ্যাপনার পাশাপাশি অরুণাচল চ্যাটার্জি বিভিন্নস্থানে ঘুরে বেড়ানোটা অভ্যেসে পরিণত করেছেন। বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থিত জীববৈচিত্র্য তাঁকে আকৃষ্ট করে আর তাই জলে-জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘোরার নেশা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সহযোগিতা করে।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

গ্রামের নাম মূলখরকা

অর্পিতা চক্রবর্তী

~ মূলখরকা লেকের আরও ছবি ~

জীবনে যে কোনোদিন ট্রেকিং করতে পারব সেই ভাবনাটা হয়তো শুধু স্বপ্নই থেকে যেত যদিনা সুদীপ্তদা-র দৌলতে এই ছোট্ট গ্রামটি ঘুরতে না যেতাম।

গ্রামটির নাম মূলখরকা। কালিম্পং-এর শেষপ্রান্তে এর অবস্থান। যদিও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু সিকিমের মধ্য দিয়ে বেশ কিছুটা পথ যেতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে এই গ্রামে যাওয়ার যে রাস্তা রয়েছে তা এখনও সেভাবে পরিচিতি পায়নি, গাড়ির যাতায়াতও খুব কম।

১০ মার্চ, ২০২০, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে পাহাড়ি রাস্তার মহিমা দেখতে দেখতে কালিম্পং-এ ঢুকলাম, তখন প্রায় ঘড়ির কাঁটা দুপুর বারোটা। এখনও অনেকটা পথ যাওয়ার বাকি। সকালে রাস্তায় জলখাবার সেরে তিস্তা নদীর কোলাহল কানে শুনতে শুনতে যাত্রাপথটি বেশ মোহময় হয়ে উঠেছিল। তবে এই মোহময় আবেশ আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না সিকিম পেরিয়ে যখন আমাদের গাড়ি মূলখরকা রওনা দিল, বুঝতে পারলাম যাত্রাপথ কতখানি দুর্গম হতে চলেছে। বিশাল বড় বড় পাথর ছড়িয়ে রেখে রাস্তার রূপ দেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ দেব গাড়ি চালককে, কতটা ধৈর্য্য থাকলে সেই রাস্তায় গাড়ি চালানো যায়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন দুজন বয়স্ক মানুষ – সুদীপ্তদার বাবা আর মা। তাঁদের অবস্থা যে কতটা করুণ হয়েছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা, আর ছিল দুটি বাচ্চা, তাদের একটির বয়স এক বছর চার মাস।

সত্যি বলছি, জীবনে এমন অবস্থায় এই প্রথমবার পড়েছিলাম, ফিরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। গাড়ি এগোচ্ছিল খুব ধীর গতিতে, ঘড়িতে তখন দেড়টা বাজে। কিন্তু একটা জিনিস না বললেই নয়, চারপাশের যা দৃশ্য দেখছিলাম, তাতে সারাদিনের ক্লান্তি আর খিদে দুটোই ভুলিয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে, যখন গ্রামটিতে পৌঁছালাম শরীর আর বাঁধ মানলো না, যেমন ঠাণ্ডা ঠিক সেইরকমই শরীরের ব্যথা। তাড়াতাড়ি যে যার ঘরে গিয়ে শীতের কাপড় পরে নিলাম। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘরে গিয়ে যখন একটু বিশ্রাম নিলাম তখন ঠিক বিকেল চারটে। শরীর আর দিচ্ছিল না।

মূলখরকা একটি ছোট্ট গ্রাম। খুব বেশি হলে সব মিলিয়ে পাঁচটি বা ছটি ছোট ছোট বাড়ি, আর তাদের নিজস্ব কিছু ছোট ছোট হোম-স্টে যেখানে ট্যুরিষ্টদের থাকতে দেওয়া হয়। আমরা যেখানে ছিলাম সেই বাড়ির কর্ত্রী ছিলেন পূর্ণিমা ছেত্রি, বছর পঁচিশের এই তরুণীর অসামান্য আতিথেয়তা। তিনি আর তার ভাই দুজনে মিলে এই হোম-স্টেটি চালান। আর ছিলেন তাঁদের একজন কর্মী, সন্তোষ সজোক, তিনি রান্নার দিকটা দেখতেন। জায়গাটি এতটাই উঁচুতে যে রান্নার চাল প্রেসার কুকারেও ঠিকঠাক সিদ্ধ হয় না। আমরা যাওয়ার পর দুপুরে ওখানে খেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তাড়াহুড়ো করে রান্না করেছে তাই বোধহয় ভাত এত শক্ত, কিন্তু পরে জানলাম, এখানে এইরকমই চাল সিদ্ধ হয়। আর হ্যাঁ, এখানে কিন্তু কোনোরকম দোকান বা কিছু কোনোকিছুরই আশা করা বৃথা, পানের জন্য ঝরনার জল-ই ভরসা, আমরা সবাই নিজেদের বোতলে ঝরনার জল ভরে নিচ্ছিলাম, সে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

চারপাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে নেমে যাওয়াতে সেদিন চারপাশটা আর কিছুই দেখতে পেলাম না। আমার তো বিকেলের পরই এত ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল যে প্যারাসিটামল খেতে হয়েছিল। আর হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলায় একটা

খাবার শেষ করলাম। যথেষ্ট ভয় ছিল মনে মনে। আমরা এমন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জায়গায় আছি, ডাক্তারের দরকার হলে কী করব জানি না।

পরদিন সকাল হল। কিন্তু চারদিকে শুধুই সাদা। এক হাত দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আর তেমন ঠাণ্ডা। তখন ভোর ছটা। প্রকৃতি যেন কিছুতেই সাদা চাদর থেকে বাইরে আসতে চাইছে না। বেলা আটটার সময় যখন চারদিক অল্প পরিষ্কার হল, সত্যি বলব, মনে হল যেন কৈলাস, হ্যাঁ, ঠিকই বললাম মনে হল যেন কৈলাস-এ এসেছি। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা, পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট ঘর, নাম-না-জানা ফুলের বাহার, আর অজানা পাখির ডাক। আমাদের ঘরের সামনেই আলুর ক্ষেত, দূরে ঝরনার আওয়াজ, পাইপ দিয়ে সেই ঝরনার জলই এরা সব কাজে ব্যবহার করছে। বুঝতে পারলাম কত কষ্টকর এদের জীবন। আমরা গিয়েছিলাম মার্চ মাসে, তাতেই জল বরফ হয়ে যায়, তখন এদের খুব সমস্যা হয়। শীতকালে তো এরা এখানে থাকেই না। মূলখরকায় একটি সুন্দর আর বিখ্যাত লেক আছে। কথিত আছে, শিব পার্বতী নাকি এই জলাশয়ে স্নান করতে আসতেন। খুব পবিত্র সেই জায়গাটা। কিন্তু সেই লেক-এর রাস্তা খুবই দুর্গম। রাস্তা বলে কিছু নেই। একদম পাহাড় চূড়ায়। সেইটাই আমাদের লক্ষ্য। চিন্তা করছিলাম এই এক বছর চার মাসের বাচ্চাকে নিয়ে কীভাবে সেটা সম্ভব? ভীষণ দুর্গম রাস্তা। ছয় থেকে সাতটি স্লোপ আছে। কিন্তু কথায় আছে মহাদেব যেখানে ডাকবেন, তাঁর ডাক ফেরায় কার সাধ্য। সুতরাং বেবি কেরিয়ার নিয়ে, মনে একটু ভয় আর বুকভরা আশা নিয়ে রওনা হলাম মূলখরকা লেক-এর দিকে। যাত্রার শুরুতেই হোঁচট খেলাম কারণ একটা একটা করে পাথর পেরিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে হবে। বুঝলাম, যাত্রাপথ একদমই সহজ হবে না। তাও পিছপা হইনি, বাচ্চাটাকে সাবধানে ধরে খুব আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলাম। জীবনের প্রথম ট্রেকিং এতটা চ্যালেঞ্জিং হবে, সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিছুটা ওঠার পর যথারীতি দাঁড়াতে হল, অসম্ভব কষ্ট হচ্ছিল। সুদীপ্তদার মুখে শুনেছিলাম, পাহাড়ি অঞ্চলে একটা জংলি গাছ আছে, নাম তিতপাতি গাছ। সেই গাছের পাতা সাধারণত অক্সিজেন সরবরাহ করতে সাহায্য করে। তাই ট্রেকিং-এর সময় এই গাছের পাতা সঙ্গে রাখতে হয় আর মাঝে মাঝে ওই পাতার ঘ্রাণ নিলে কষ্ট কম হয়। সুতরাং সেটাই করছিলাম। আমি আর আমার স্বামী দুজনে ভাগাভাগি করে বাচ্চা নিয়ে হাই পিকে উঠব, এই রকম অভিজ্ঞতা হয়তো কেউই আন্দাজ করতে পারিনি।

তবে হ্যাঁ, সঙ্গের অন্য শিশুটি, নাম কুহু, যার কথা না বললেই নয়, ভগবান শিব বোধহয় সব শক্তি ওকেই দিয়েছিলেন। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে, কী অবলীলায় সে ওপরে উঠছিল। মনে মনে বলছিলাম, ভগবান যেন সারাজীবন ওকে এইরকমই উচ্ছল রাখে। এক একটা স্লোপ উঠতে আধঘন্টারও বেশি সময় লাগছিল। কুড়ি মিনিটের রাস্তা, কিন্তু পৌঁছালাম আড়াই ঘণ্টায়।

ওপরে উঠে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সে কী অপরূপ দৃশ্য, আমরা একদম পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে একটি আয়তাকার লেক, জল খুব বেশি নয়, তার পাশে মহাদেব-এর মন্দির। চারদিক ঝাউ গাছ দিয়ে ঘেরা, এই উঁচুতেও যে এত সবুজ গাছ থাকতে পারে, এটাও একটা বিস্ময়। সত্যি আমার চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল, ওপরে উঠতে যে কী কষ্ট হয়েছিল, শুধু আমরাই জানি। তবে হ্যাঁ, আশার আলো এটাই যে, দেখেছিলাম রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, কবে শেষ হবে জানা নেই, যদি শেষ হয়, হয়তো গাড়ি ওই লেক অবধি যাবে। তখন হয়তো এত কষ্ট হবে না। কিন্তু কেউই এই ট্রেকিংয়ের ভয়মিশ্রিত রোমাঞ্চকর মজা আর পাবেও না। আর একটা কথা, জেঠিমাও আমাদের সঙ্গে ওপরে উঠেছিলেন। তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে আমার প্রণাম।

নিচে নামতে প্রায় একটা বেজে গিয়েছিল, অসম্ভব খিদের কষ্ট নিয়েও যে বাচ্চাদুটো এই দেবদর্শনে সমর্থ হয়েছিল, সেটাও খুব ভাল লেগেছিল। খাওয়াদাওয়া শেষ করতে করতে প্রায় দুপুর দুটো বেজে গিয়েছিল। পরের দিন রওনা দিয়েছিলাম ফেরার পথে।

~ মূলখরকা লেকের আরও ছবি ~

পেশায় শিক্ষিকা হলেও অর্পিতা চক্রবর্তী কর্মস্থল আর সংসার সামলে গাছ, জল, মাটি আর পাহাড় দেখার টানে বেরিয়ে পড়েন মাঝেমধ্যেই। এবার "আমাদের ছুটি"-কে পেয়ে সেইসব দেখাকে লেখার রূপ দেওয়ার সুপ্ত ইচ্ছে পূর্ণ হল।

শীতকালে করবেটের জঙ্গলে

পাপড়ি সাহা

জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক' নামটা আজ খুবই পরিচিত সবার কাছে। সাধারণতঃ মানুষ করবেটের জঙ্গল বলতে প্রথমেই বোঝেন 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা জঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ বটে। কিন্তু শুধু বাঘই নয়, আরও নানান প্রজাতির জীবজন্তুও এই অরণ্যে রয়েছে। পাহাড়, পাহাড়ি-নদী, গাছ-গাছালি, পশু-পাখি সব মিলিয়ে জঙ্গলের চরিত্রটাই অন্যরকম।

উত্তরাখণ্ডের বনদপ্তরের তরফ থেকে জঙ্গলের ভিতর বিভিন্ন স্থানে থাকার সুব্যবস্থা আছে। নৈনিতাল জেলার রামনগর নামের একটি ছোট্ট শহর। এখান থেকেই সরকার অনুমোদিত হুডখোলা জিপসি বা ক্যান্টর-এ করে বনের ভিতরে যেতে হয়। আর যদি জঙ্গলের ভিতর বনবিভাগের অতিথিশালায় এক বা দুইরাত্রি যাপনের বুকিং থাকে, তবে জিপসিই একমাত্র গাড়ি। জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ থেকে শুরু করে, রাত্রিযাপন সেরে জঙ্গলের বাইরে বেরোনো পর্যন্ত সর্বদা গাড়ি ও তার চালক অতিথিদের সঙ্গেই থাকবে।

করবেট ন্যাশনাল পার্কের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় জায়গা হল 'ধিকালা'। 'ধনগড়ুহি' গেট দিয়ে ধিকালায় যেতে জঙ্গলের ভিতর চার জায়গায় সরকারি রেস্টহাউস আছে। সুলতান, গৈরাল, শার্পডুলি ও ধিকালা। রামনগর শহর থেকে ধিকালার প্রবেশদ্বার ধনগড়ুহি-র দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। শীতকালের করবেট ভীষণই আকর্ষণীয়। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়। গেট দিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে কিছুদূর যাবার পরই বোঝা যায় যে, বাইরের বৈষয়িক জগতের থেকে এ

তিনজন) 'করবেট ন্যাশনাল পার্ক' এ বেড়াতে যাব। নয়ডা থেকে রামনগরের মোটরদূরত্ব ২৫০ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগে পাঁচ ঘন্টা। তবে থেমে থেমে, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে গিয়েছিলাম বলে রামনগর পৌঁছতে সময় লেগেছিল ছয় ঘন্টা। সে রাতে রামনগরের কুমায়ুন মন্ডল বিকাশ নিগম (KMVN)-এ ছিলাম। আগামী দুরাত জঙ্গলের ভিতর থাকার বুকিং করাই ছিল। পরদিন ১ জানুয়ারি ভোর চারটেয় উঠে তৈরি হলাম। গাড়ি রেখে, জিপসিতে চেপে রওয়ানা দিলাম জঙ্গলের উদ্দেশ্যে।

ধনগড়হি-র গেট দিয়ে গাড়ি ঢোকার পর শুরু হল অরণ্যে পথ চলা। গাড়ি চলছে জঙ্গলের প্রধান রাস্তার ওপর দিয়ে। পাশে বয়ে চলেছে রামগঙ্গা নদী। নদী কখনও একেবারে পাশে, কখনও দূরে, কখনও অনেক নীচে আবার কখনওবা রাস্তাটাই গেছে নদীর বুকের নুড়ির ওপর দিয়ে। প্রধানত শাল ও শিশু গাছের বন। বড় বড় শাল গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। শীতের সকালে গাছের মাথায় নরম সোনালি রোদ পড়েছে। কিন্তু গাছের বড় বড় পাতা ভেদ করে সে রোদ মাটিতে প্রায় আসছেই না। রোদের মধ্যে ছিদ্রযুক্ত ছাতা নিয়ে বের হলে, ছিদ্রপথের মধ্যে দিয়ে গায়ে যেমন ছোট ছোট গোল গোল রোদ পড়ে; তেমনই ঝাঁকড়া গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট, গোল গোল, ছেঁড়া ছেঁড়া রোদ এসে পড়ছে মাটিতে। কোনও কোনও জায়গায় অনেকটা রোদ গোল হয়ে মাটিতে এসে পড়লে সেটিকে নাটকের মঞ্চের 'স্পট লাইট'-এর মত মনে হচ্ছে। এমনই এক অদ্ভুত আলো-আঁধারি রোমাঞ্চকর পরিবেশ।

জঙ্গলের ভিতর প্রথম রেস্টহাউস 'সুলতান' গেট থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে। শীতকালের জানুয়ারি মাসে ঠাণ্ডার প্রকোপ সবথেকে বেশি। তার ওপর লোকালয়ের তুলনায় জঙ্গলের ঠাণ্ডা আরও অনেকটা বেশি। উলেন ইনার, গরম জামা-প্যান্ট,

ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস যেন ধারালো দাঁত দিয়ে অনাবৃত নাকের ডগা ও গালদুটো কামড়ে ধরছে। জঙ্গলের ভিতর গাড়ি চলছে মন্থর গতিতে। রাস্তার দুপাশে দেখা যাচ্ছে চিতল ও সম্বরের দল। গাড়ির শব্দে কেউবা সচকিত চোখে তাকিয়ে দেখছে, কেউ বা ভ্রূক্ষেপও করছে না। আবার কেউ গাড়িকে অগ্রাহ্য করে রাস্তার একপাশের জঙ্গল থেকে ছোট্ট ছোট্ট লাফ দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে অন্য পাশের জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। হরিণশিশুগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে মায়ের ল্যাজ ও চারপায়ের আশেপাশে। একটু পিছিয়ে পড়লেই ছোট্ট ছোট্ট লাফে আবার চলে আসছে মায়ের কাছে। মায়ের শরীরের আড়াল থেকে অবাক দুটি কালো চোখ মেলে দেখছে জগতের সবকিছু। চিতল বা স্পটেড ডিয়ার ও সম্বর ডিয়ার ছাড়াও এখানে রয়েছে হগ ডিয়ার ও বার্কিং ডিয়ার। আশেপাশের সব গাছ ও ঝোপে নানারকম পাখি – তাদের উপস্থিতি যত না চোখে দেখা যায়, তার তুলনায় কানে শোনা যায় অনেক বেশি।

এখানের একটা বিশেষ নিয়ম হল রেস্টহাউসের বাইরে বনদপ্তর অনুমোদিত দু-একটি বিশেষ স্থান ছাড়া অতিথিরা তো বটেই, এমনকি গাড়ির চালকদেরও জঙ্গলের মাটিতে নামার অনুমতি নেই। তার মধ্যে একটি হল 'হাইব্যাঙ্ক', যেখানে রামগঙ্গা নদীটা অনেক নিচে। এখান থেকে রামগঙ্গা নদীর গতিপথ অনেক দূর পর্যন্ত বাধাহীনভাবে দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ি নদীর জল কোথাও খুব বেশি, কোথাও খুব কম। নদীতে অনেক কুমিরের বাস। হাইব্যাঙ্ক থেকে নদীর চড়ায় কুমির, হরিণ, বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখা যায়। আবার ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে এখান থেকে হাতির দল বা বাঘের দেখাও পাওয়া যায় অনেক সময়। তবে আমরা এখান থেকে কুমির এবং নানান পাখি দেখতে পেলাম। আর বলা বাহুল্য, বাঁদরের উপস্থিতি তো সর্বত্রই।

সাধারণতঃ জঙ্গল মানেই বুঝি শুধুই সবুজের সমারোহ; সবুজ রঙের বিভিন্ন রকমফের। তবে রুক্ষ শীত ঋতুতেও করবেট কিন্তু রঙিন। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, খয়েরি, সাদা, কালো – এ সব রঙেরই বিভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। বনপথে যেটুকু অংশের

সেই পাতার রং কোনোটা লাল, কোনোটা হলুদ, আবার কোনোটা বাদামি। সবুজ রঙেরই কত রকমফের – গাছ ও ঝোপঝাড় কোনোটা সবুজ, কখনও গাঢ় সবুজ কখনোবা হালকা, আবার কখনও বা ফিকে সবুজ। নদী ও আকাশ নীল, নদীর নুড়ি পাথর সাদা বা খয়েরি, কালো শাল গাছের গুঁড়ি, হলুদ-নীল-বেগুনি ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের ফোটা ফুল – সব মিলিয়ে একেবারে 'রঙে রঙে রঙিল' জঙ্গল। এ জঙ্গলের আরও এক বিশেষত্ব প্রধানরাস্তার দুধারে বিভিন্ন মাপ ও আকারের 'উইঢিপি'।

ধনগড়হি গেট থেকে জঙ্গলের ভিতরের ধিকালা রেস্টহাউসের দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। ধিকালা এলাকার প্রধান আকর্ষণ বিরাট জলাশয় (রামগঙ্গা রিজার্ভার), গ্রাসল্যান্ড ও সম্বর রোড। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে এই গ্রাসল্যান্ডের ঘাস কেটে নেওয়া হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে জলাশয়ের ধারের এই বিস্তীর্ণ এলাকাটা বাধাহীনভাবে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রাসল্যান্ডটিকে জংলি জীবজন্তুর 'জীবন্ত রঙ্গমঞ্চ' বলা যেতে পারে। হাতির দল, হরিণের পাল, বুনো শুয়োর এমনকি হলুদ-কালো ডোরাকাটাদেরও খুব পছন্দের জায়গা হল এই গ্রাসল্যান্ড। জলের ধারে হাতির দল খেলা করে, হাতির ছোট বাচ্চা চলে তার মায়ের চারপায়ের ঠিক মাঝখানে। ওটাই ওদের সবচেয়ে পছন্দের ও নিরাপদ স্থানও বটে। হরিণের দল এদিক ওদিক ঘাস খায়, কেউবা বিশ্রাম নেয়। বুনো শুয়োর মাটি শুঁকতে শুঁকতে ঘুরে বেড়ায়; আবার কখনোবা নিজেদের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো যুদ্ধও শুরু করে দেয়।

যদিও খুবই বিরল ঘটনা, তবে কেউ কেউ এই গ্রাসল্যান্ডে বাঘকে হরিণ শিকার করতেও দেখেছে। ধিকালার রেস্টহাউসের আশেপাশে অনেক শিয়ালের বাস। গ্রাসল্যান্ডে পৌঁছে দেখলাম ছোট একটি হাতির পাল, সেখানে বাচ্চা হাতিও রয়েছে। কিছু হাতি জলে নেমে খেলা করছে, আর কিছু গ্রাসল্যান্ডে ঘাস খাচ্ছে। আর তাদের সামনে, মানে কিছুটা আমাদের দিকে হরিণের পাল ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। অপূর্ব দৃশ্য। এখানে দাঁড়িয়ে বেশ অনেকটা সময় কেটে গেল। এবার চলে গেলাম ধিকালা রেস্টহাউসে।

জঙ্গলের ভিতরের রেস্টহাউসে রাত্রিযাপন করলে তবেই এই জঙ্গলকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। রেস্টহাউসের চারপাশের পুরো এলাকাটি বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে, যাতে বন্যজন্তু এই এলাকায় ঢুকতে না পারে। জঙ্গলে অতিথিদের কাছে সর্বক্ষণের জন্য গাড়ি থাকলেও জঙ্গলে ভ্রমণের জন্য বনদপ্তরের তরফ থেকে সকালে এবং বিকালে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা আছে। এই নির্ধারিত সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু বনবিভাগের রেস্টহাউস চত্বরে থাকা বাধ্যতামূলক।

শীতকালে সকাল সাতটা নাগাদ করবেটের আকাশ তখনও পরিষ্কার হয় না, জঙ্গলে প্রবেশের জন্য গেট খুলে যায়। রেডি হয়ে গেটের সামনে চলে এলাম। রেস্টহাউসের ভিতর গেটের সামনে গাড়িগুলোতে চালকরা ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। গেট খুলতেই একে একে সমস্ত গাড়ি ব্যস্তভাবে বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলের বিভিন্ন পথে। সবার উদ্দেশ্য একটাই – 'বাঘদর্শন'। বাঘ দেখার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি খুব ভোরে বা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে। জঙ্গলের যেসব স্থানে বাঘ দেখতে পাওয়া যেতে পারে, গাড়িগুলো সেসব দিকেই প্রথমে রওয়ানা দেয়। বাঘের গতিবিধি নির্ণয় করা যায় দুভাবে। প্রথমত বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আর দ্বিতীয়ত জংলি জীবজন্তুর 'অ্যালার্ম কল' বা 'সতর্ক ধ্বনি' অনুসরণ করে। সাধারণত বন্য জীবজন্তুরা দিনের তুলনায় রাতে চলাচল করে অনেক বেশি; বাঘও তাই। বাঘের পায়ের থাবার তলার দিক নরম হয়। তাই বাঘ জঙ্গলের ভিতর মেঠোগাড়ির পথে বা হাতির চলার পথ ধরে হাঁটা পছন্দ করে। গাড়ির চালকরা তাই ভোরবেলা জঙ্গলে বেরিয়েই আগে মেঠো রাস্তায় বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে বেড়ায়। যদি তা পেয়ে যায় তাহলে সেই চিহ্নকে নষ্ট না করে, তাকে অনুসরণ করে চলতে থাকে। শীতের সকালের আলো তখনও ফোটেনি। ঘন কুয়াশার আস্তরণে চারিদিক এতোটাই ঝাপসা যে, পাশের ঝোপঝাড়গুলিও স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না – এমনই এক প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ পথে আমাদের গাড়ি চলেছে ধীরগতিতে।

বাঘ মাংসাশী প্রাণী; তাই তৃণভোজীরা যেমন বিভিন্ন হরিণ, বাঁদর, এমনকি ময়ূরও বাঘকে এড়িয়ে চলে। এদের কারোর ঘ্রাণশক্তি বা কারোর দৃষ্টিশক্তি প্রবল হয়। কেউ যদি আশেপাশে বাঘের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে, তবে এদের গলা থেকে একপ্রকার বিশেষ শব্দ আপনাআপনিই বেরিয়ে পড়ে। সেই আওয়াজ আশেপাশের বাকি জন্তুদের সবাইকে সতর্ক করে দেয়। একেই বলে অ্যালার্ম কল বা সতর্কধ্বনি। এই কল শুনে গাড়ির চালকরাও বাঘের গতিবিধি অনুসরণ করার চেষ্টা করে। চালকরা কল হওয়ার কাছাকাছি স্থানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দে বাঘের জন্য অপেক্ষা করে। ভোরেরও আগে আবছা আলোয় এই অপেক্ষার সময়টুকুও টান টান উত্তেজনা, অজানা আশঙ্কা, আবেশ ও রোমাঞ্চে ভরপুর। এই বুঝি চোখের সামনে ঘটে যাবে কোনো এক উত্তেজনাপূর্ণ রোমহর্ষক ঘটনা। যে কোনো মুহূর্তে বাঘ বা হাতি বা অন্য যেকোনো বন্য জন্তু চোখের সামনে স্বমহিমায় উপস্থিত হতে পারে; অনেক সময় হয়ও।

কনকনে শীতের ভোরে জঙ্গলের এই নিঃশব্দ পরিবেশে অনেক অতি মৃদু শব্দও কানে ধরা পড়ে। পাখিরা তখনও বের হয়নি। বার্তালাপও বন্ধ, চারিদিক থেকে ভেসে আসছে হিম পড়ার শব্দ। নিঃশব্দ জঙ্গলে বড় শালপাতার ওপর সামান্য এই হিমের বিন্দু পড়ার শব্দকেও অত্যন্ত ভারী বলে বোধ হচ্ছে। পাশের ঝোপের শুকনো পাতার খসখসানি, এমনকি একে অপরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও ভালোভাবে অনুভব করতে পারছি। জঙ্গলের শীতল পরিবেশে চারিদিকে যখন হিমের বিন্দুগুলো মাটির ওপর ঝরে পড়ছে, তখন তা বৃষ্টি পড়ার মত অনুভূত হচ্ছে, এমনকি চাক্ষুষ দেখাও সম্ভব হচ্ছে।

ধিকালার আরো একটি বিশেষ আকর্ষণ 'সম্বর রোড'। এটি ওয়ান ওয়ে। মাটির অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ। একটি গাড়িই ভালোভাবে চলতে পারে। গাড়ি ধীরগতিতে এই পথে চলার সময়ও খুব সচেতনভাবে বসতে হয়। রাস্তার দুধারের ঝোপের ডালপালা গায়ের ওপর এসে পড়ে কখনও কখনও। কোনও গাড়ি যদি পিছন থেকে এসে আগে যেতে চায়, তবে জঙ্গলের ঝোপের একদিকে একটা গাড়িকে চেপে দাঁড়িয়ে তবেই অন্য গাড়িকে যাওয়ার পথ করে দিতে হয়। ভোরের আবছা আলো-আঁধারি পরিবেশে ঘন কুয়াশায় ঢাকা 'সম্বর রোড' যেন আরো রহস্যময় হয়ে ওঠে।
এরই মধ্য দিয়ে নিঃস্তব্ধ জঙ্গলের পথ ধরে আমাদের গাড়ি চলছে ধীর গতিতে। সামনে-পিছনে আর কোনও গাড়ি ছিল না। হঠাৎই পথের ধারের ঝোপ থেকে শোনা গেল তীব্র গর্জন। একবার নয় - দুবার তিনবার। অনুভব করলাম আমাদের গাড়িটা চলতে চলতেই কেঁপে উঠলো। নিত্য যাতায়াতকারী চালকের হাতও স্টিয়ারিং-ধরা অবস্থাতেই এক মুহূর্তের জন্য হলেও নড়ে গেল। আর আমাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে গলা পর্যন্ত উঠেই নেমে গেল। দুই হাতের তালু ওই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও ভিজে উঠল। চোখ একটু ধাতস্থ হলে দেখলাম, রাস্তা থেকে ৭-১০ মিটার দূরে ঝোপের আড়ালে হলুদ-কালো ডোরা, এক জোড়া; নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। বাকরুদ্ধ হয়ে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে দেখতে লাগলাম দুটিকে। হয়ত দেখেছিলাম এক-দু মিনিট। কিন্তু সেই স্বল্প সময়কেই ওই পরিবেশে বহু প্রলম্বিত বলে অনুভূত হয়েছিল। বাঘ-বাঘিনী আলাপে ব্যস্ত ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ আমাদের উপস্থিতি তাদের পছন্দ হয়নি। তাই একটু বাদেই হয়তোবা বিরক্ত হয়ে নিজেরাই চলে যায়। এ যেন এক রোমহর্ষক অনুভূতি।

আর একটু আকাশ পরিষ্কার হলে টকটকে লাল সূর্য গাছের ওপর দিয়ে আকাশে উঁকি দিল। ধীরে ধীরে সকালের মিঠে সোনালি রোদ জঙ্গলের গাছ-গাছালির মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। তখন যেন জঙ্গলের নাটমঞ্চের দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়ে গেল। এইসময় সবথেকে বেশি বের হয় পাখিরা। ভোরের মিঠে নরম রোদ গায়ে মেখে, কলতান তুলে, লেজ উঁচিয়ে নেচে বেড়ায় গাছের মাথায় মাথায়। সে এক অপূর্ব ঐকতান। এইভাবেই ধীরে ধীরে দৃশ্যপটের পরিবর্তন হতে হতে একসময় রেস্টহাউসে ফেরার নির্ধারিত সময় চলে এল। দুপুরের সময়টুকু জঙ্গলের প্রাণীদের বিশ্রাম নেওয়ার সময়।

জঙ্গলের প্রতিটি রেস্টহাউসে বাঁদরের উৎপাত প্রবল। হাতে প্লাস্টিক ব্যাগ দেখলেই তারা জঙ্গিহামলা চালায়। ছাদের ওপরের জলের ট্যাঙ্ক যদি ভালো করে ঢাকা না থাকে, তাহলে তেনারা ঢাকা খুলে তার মধ্যে ডুব দিয়ে স্নানও সারেন। সুযোগ পেলেই ক্যান্টিনের রান্নাঘর থেকেও লুঠপাট চালান। রান্নাঘরের জালের জানলার বাইরে বসে লোভাতুর দৃষ্টিতে খাদ্যসামগ্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ধিকালার রেস্টহাউসের অবস্থান রামগঙ্গা রিজার্ভারের ঠিক ধারে। রিজার্ভারের চড়াতেও বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের দেখা মেলে। এই জায়গাটাকেও আর একটা রঙ্গমঞ্চ বলা যায়। এই দৃশ্যপটের বিস্তার এতটাই বেশি যে জীবজন্তুর কার্যকলাপ নজরে আনার জন্য সময় বিশেষে দূরবীনেরও প্রয়োজন হয়। এখানেও চড়ায় হরিণের পাল বিশ্রাম নিচ্ছে; কোথাও জলে মেছো কুমির সাঁতার কাটছে, আবার কোথাওবা চড়ায় পাথরের মতো পড়ে আছে। ময়ূর-ময়ূরী ঘুরে বেড়াচ্ছে, একজন পেখম মেলে ধরেছে। এখান থেকেও হাতির দলকে জলের ধারে বা জলে খেলা করতে দেখা যায়। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে এখানেও ব্যাঘ্রদর্শন ঘটতে পারে। এছাড়া জলের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পাখি; যেমন – হেরণ, ঈগল, স্টর্ক, আইবিস্, করমোর‍্যান্ট, শিকারের আশায় বসে থাকা মাছরাঙা ইত্যাদি। চড়ায় শকুনও দেখা যায়। এখন সবাই নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত। কেউ উড়ন্ত, কেউ শিকাররত, কেউ বিশ্রামরত আবার কেউবা জলের ধারে ধ্যানমগ্ন। আশেপাশের গাছে নজর ঘোরাতে ঘোরাতে দেখলাম, কোটরের ভিতর গুটিসুটি মেরে বসে থাকা পেঁচা-পেঁচি। দুপুরের নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করল কাঠঠোকরা আর উড়ন্ত টিয়ার ঝাঁক।

পরেরদিন সকালে গাড়ির চালক আমাদের নিয়ে গেল 'লকড়ি পুল' বলে একটি জায়গায়। এখানে রামগঙ্গা নদীর জল খুব গভীর নয়, তবে চড়া বিস্তীর্ণ। জল বইছে চড়ার একধার দিয়ে। জলের ওপর কাঠের একটি ভাসমান পুল ফেলা আছে, যা দিয়ে গাড়ি পারাপার করতে পারে। আমাদের গাড়ি সেই পুলের ওপর দিয়ে জল পেরিয়ে গিয়ে ওপারে নদীর নুড়ি পাথরের চড়ার ওপর দাঁড়াল। চারপাশের দৃশ্য অতি মনোরম। নুড়ি-পাথর বিছানো বিস্তীর্ণ এলাকা; এক পাশ দিয়ে বইছে নদী। আর একধারে জঙ্গল পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। নদী-আকাশ-বনানী সব যেন এখানে মিলেমিশে একাকার। আমাদের গাড়ি ছাড়া আর একটাই মাত্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে চড়ায়। অতি শান্ত পরিবেশ; মাঝে মাঝে পাখির ডাক ও নিরবচ্ছিন্ন নদীর কলধ্বনি। জায়গাটা আমাদের খুব ভালো লাগল। গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পাখিদের মাছ শিকার দেখছিলাম। কত সময় কেটেছিল জানি না, হঠাৎ গাড়ির সাইড মিরারে একটা প্রতিচ্ছবি দেখে চালক আমাদের সচেতন করে দিল। আমরা নিঃশব্দে পিছন ঘুরে দেখলাম, বেশ খানিকটা দূরে, পাশের পাহাড়ি জঙ্গল থেকে নিঃশব্দে একটা বাঘ কখন বেরিয়ে নদী পার হচ্ছে। সে এতটাই নিঃশব্দে এসেছিল যে কেউ টের পাইনি। খোলা নদীবক্ষের অর্ধেক পথ পেরিয়ে যাওয়ার পর তার আগমন টের পাই। অবাক বিস্ফারিত চোখে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আস্তে আস্তে তার পুরো শরীরটা নদীর চড়া পেরিয়ে ঘাসবনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তারপর সম্বিত ফিরে পেলাম। আর কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম রেস্টহাউসে।

শীতকালের বিকেলে জঙ্গলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আবার একেবারে অন্যরকম। বেলা আড়াইটে নাগাদ প্রবেশের জন্য গেট খোলে। সকালে যেমন সবাই জঙ্গলের গেট খোলার অপেক্ষায় ব্যগ্র থাকে, বিকেলে ততটা থাকে না। কারণ বাঘ দর্শনের সম্ভাবনা সবথেকে বেশি সন্ধ্যার দিকে। তাই গাড়িগুলো জঙ্গলে ঢুকে ধীরগতিতে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের গাড়িও মন্থর গতিতে চলতে থাকল। অনেক সময় শ্রান্ত পশুরা দুপুরে জলাশয়ে জলপান করতে আসে আর তার পাড়েই বিশ্রাম করে। তাই গাড়ি আগে জলাশয়ের ধারে অনুসন্ধান করল। বেশ কিছুসময় অপেক্ষা করে গাড়ি আবার জঙ্গলের পথে ঘুরতে শুরু করল। অ্যালার্ম কল যেখানে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই অপেক্ষা করছি ; যদি কোনও কিছু দেখা যায় তার আশায়।

দুপুরের এই অপেক্ষারত সময়টার স্বাদ একেবারে ভিন্ন। নিঃস্তব্ধ দুপুরের মৌনতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে টিয়ার ঝাঁক বা হর্নবিলের দল। দূর থেকে ভেসে আসছে কাঠঠোকরার ঠক্-ঠকানি। তা যেন জঙ্গলের বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। থেকে থেকে পাশের ঝোপ থেকে ডেকে উঠছে দু-একটি বনমোরগ বা ময়ূর। এরসঙ্গে একঘেয়ে ঘুঘুর ডাক মিলে গিয়ে দুপুরের পরিবেশকে আরো যেন বিষন্ন করে তুলছে। কিন্তু এর মাঝেই যখন আবার অ্যালার্ম কল শোনা যাচ্ছে, তখনই ইন্দ্রিয়গুলো আবার সজাগ ও শরীর টান টান হয়ে উঠছে। কল শুনলেই বাঁদরগুলো আগে লাফিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে পড়ছে। অনেক সময় অপেক্ষা করেও আশানুরূপ জন্তুর দর্শন মেলে না। আবার নতুন করে অনুসন্ধান করার পালা

লম্বা লেজবিশিষ্ট, হলুদ-কালো ডোরাকাটা, জ্বলজ্বলে চোখের প্রাণীটির দর্শন সবচেয়ে রোমাঞ্চকর; এক অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য অনুভূতি। এই বিশেষ প্রাণীটির যেন এক আলাদা আকর্ষণ আছে। একবার দেখা দিলে সে যেন এক আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি দিয়ে সবার দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে। এ নেশা যেন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। এমনকি সে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলেও আরো দেখার আকুলতাটা রয়েই যায়। ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে আসে ও রেস্টহাউসে ফেরার নির্ধারিত সময় আসন্ন হয়।

রাতের করবেট আরোও রহস্যময়ী। দূষণমুক্ত পরিবেশ বলে কালো আকাশের বুকে সুস্পষ্ট তারামণ্ডলী হীরের মতো ঝকঝক করে জ্বলে। রাতের আকাশের এত নক্ষত্রমন্ডল খালি চোখে যে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যেতে পারে, তা শহরবাসীদের কল্পনার অতীত। অন্ধকারে জলের ধারে টুনিবালবের মতো অসংখ্য আলোকবিন্দু নড়তে দেখা যায়। এই আলোকবিন্দুগুলো আর কিছুই নয়, রাতে জলপান করতে আসা বুনো শুয়োর, হরিণের পালের মত নানান জীবজন্তুর চোখ। এই দৃশ্যপটের সঙ্গে মিশে যায় দূর থেকে ভেসে আসা ময়ূর, হাতি, বাঘ ইত্যাদি জীবজন্তুর ডাক ও পেঁচার ডানা ঝাপটানি। আর তাতে সঙ্গত দেয় ঝিঁঝিঁপোকার কনসার্ট ও রামগঙ্গা নদীর নিরবচ্ছিন্ন কলকল ধ্বনি।
প্রকৃতির মধ্যে বাস করলে তবেই অনুভব করা যায় যে, সংগীত জগতের সপ্তসুরের উৎপত্তি কোথা থেকে; বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির আদি উৎপত্তিই বা কোথায়। নৈঃশব্দের গর্ভেও যে শব্দ নিহিত আছে, তা অনুধাবন করা যায় এই উন্মুক্ত বন্য পরিবেশেই। পাহাড়, নদী, ঝরনা, পশুপাখি, গাছ-গাছালি ও তার রঙের বিভিন্নতা – সব মিলিয়ে করবেট যেন মোহময়ী। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-বনানী – সব যেন মিলেমিশে একাকার। একবার এই মোহজালে আবিষ্ট হলে, তার থেকে নিজেকে মুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই 'আরণ্যক' পরিবেশ যেন বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে।

~ [ভিয়েনার আরও ছবি] ~

পাপড়ি সাহার নেশা রান্না, নাচ, বইপড়া, ভ্রমণ। নানান শহরে বসবাস ও বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সুবাদে যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ তাই-ই গল্প ও ভ্রমণকাহিনির মাধ্যমে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কুরিঞ্জি ফুলের দেশে

প্রজ্ঞা পারমিতা

নাগরিক শীত দুয়ারে নয় আর, অন্দরে হানা দিয়েছে। হেমন্ত রাতের বিছানায় পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাদর গায়ে উঠে এসে যে উষ্ণতা দিয়েছিল তা আর যথেষ্ট নয়। সুতরাং বালাপোশ, লেপ, কম্বল ইত্যাদি শীতার্তকে ওম দেওয়ার যত আয়োজন এক বছরের শীতঘুম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে একে একে। এই সময় আরও গভীর শীতের মায়ায় জড়াতে ইচ্ছে করে। অবশ্যই বেয়াড়া ইচ্ছে! কিন্তু শীতকালে সমতলের চেনা শীত ছেড়ে অচেনা শীতের স্বাদ নিতে সাধ হয়। আর ঠিক তখনই তেমন সব স্থান যেন ডাক পাঠায় আমায়। একবার যেমন ডেকেছিল দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ি শহর কোদাইকানাল। এবছর তেমন কোন আমন্ত্রণ গ্রহণ করার উপায় নেই যখন আসুন স্মৃতির সফরে আপনাদের শরিক করে নিয়ে আমার কোদাইকানাল বেড়ানোর গল্প শোনাই।

কোদাইকানাল তামিলনাড়ুর পালানি পাহাড়ের এক অসাধারণ শৈলশহর। যদিও আধুনিক কোদাইকানালের জন্ম হয় ব্রিটিশ ও আমেরিকান মিশনারিদের হাতে, কিন্তু এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রায় হাজার দুয়েক বছরের প্রাচীন তামিল সাহিত্য 'সঙ্গম কাব্যে'। দেবতা মুরুগানের সঙ্গে জড়িত বিশেষ কিংবদন্তির জন্য বিখ্যাত এই পার্বত্য এলাকা। এখানে বারো বছর অন্তর ফোটে এক বিরল পুষ্প 'নীলকুরিঞ্জি' বা সংক্ষেপে 'কুরিঞ্জি'। সেই ফুলে মুরুগান পূজিত হন। এখানে তিনি কুরিঞ্জি আন্দাভর স্বামী নামে পরিচিত। স্ট্রবিল্যান্থেস কুন্থিয়ানা প্রজাতির ফুল কুরিঞ্জি বস্তুত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বৈশিষ্ট্য। নীলগিরি পাহাড়ের নামটাও কুরিঞ্জির দান। মুন্নার উটি কুন্নুর এই সব এলাকাই কুরিঞ্জির ছোঁয়া পায় যেখানে এই দীর্ঘসূত্রী পুষ্প পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছয়, আট বা দশ বছর অন্তরও ফুল ফোটায়। কিন্তু পালানি পাহাড় অঞ্চলে কুরিঞ্জি বারো বছর অন্তরই ফোটে এবং অত্যাশ্চর্য একটি তথ্য হল পালানির আদিম অধিবাসী পালিয়ানরা ফুল ফোটা দিয়ে তাদের বয়স নির্ধারণ করেন। দুই কুরিঞ্জি দেখেছে অর্থাৎ তারা পূর্ণ যুবক বা যুবতী। এমন ফুল জড়িয়ে বেঁচে থাকার হিসেব বড় রোম্যান্টিক ঠেকেছিল আমার। এমনিতেই কোদাইকানালের কুরিঞ্জি সংযোগ একই সঙ্গে বিশেষ ভাবে রোম্যান্টিক এবং ধ্রুপদীও বটে। নীলাভ বেগনি রঙের কুরিঞ্জি ফুল যেন কিশোরীর প্রেম, কারণ তাতে মিশে রয়েছে মুরুগানের প্রতি অরণ্য-পর্বত কন্যা ভল্লির প্রেমের হাজার বছরের কিংবদন্তী। মুরুগান ভল্লিকে বিবাহ করেন কুরিঞ্জি ফুলের মালা পরিয়ে। যখন পালানি পাহাড়ের উপত্যকা অধিত্যকা ছেয়ে যায় সেই ফুলে তখন প্রকৃতি মোহময়ী হয়ে ওঠে। পুঞ্জ পুঞ্জ কুরিঞ্জি ফুলের টানে ছুটে আসা রাশি রাশি ভ্রমরের গুঞ্জরনের কথা 'সঙ্গম সাহিত্যে' বর্ণিত। এছাড়া অজস্র হ্রদ অসংখ্য ঝরনা বন পাহাড় মিলিয়ে কোদাইকানাল এক নিরন্তর প্রকৃতি উদযাপন। কোদাইকানাল শব্দের অর্থই 'অরণ্যের দান'।

ভ্রমণবৃত্তান্তে আসি। এক মেঘলা বিকেলে ঘাট রোড ধরে কোদাইকানাল শহরের দুয়ারে পৌঁছতেই এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য সিলভার ক্যাসকেড ঝরনা স্বাগত জানাল। বেড়ানোর শুরুতেই এমন প্রাকৃতিক সম্ভাষণে আপ্লুত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে এযাত্রার প্রকৃতি পাঠ শুরু করে দিলাম। কালো পাথরের গা বেয়ে অনেক ওপর থেকে নেমে আশা রূপোলি জলধারা ধাপে ধাপে তার নামটির যাথার্থ্য প্রমাণ করে বয়ে চলেছে। পাশেই স্টল থেকে মশলা চা কিনে খেতে খেতে বিকেলটা আরও মনোরম করে তোলা গেল। শুধু একটি ব্যাপার চোখের বালি মনে হচ্ছিল। ঝরনার চারপাশে পলিপ্যাক ও প্লাস্টিকের বোতলের ছড়াছড়ি! আমরা কি কোনদিন শিখব না পরিবেশকে অনাবিল রাখতে!

পরের দিন থেকে শুরু হল আসল ঘোরাঘুরি। প্রাতরাশ সেরে সারাদিনের মতো বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। প্রথমে কোদাই লেকের চারপাশ বেড় দেওয়া লেক রোডে এক পাক ঘুরে নিলাম। কোদাই লেক কিন্তু সেই অর্থে যাকে বলে ম্যানমেড লেক। ১৮৬৩ সালে মাদুরাই-এর ডিসট্রিক্ট কালেক্টার স্যার লেভিঞ্জ ছোট জলধারাগুলিকে এই পাহাড়ি উপত্যকায় ধরে রাখার ব্যবস্থা করে এই লেকের সৃষ্টি করেন। তারকাকৃতির কোদাই লেক এ শহরের মধ্যমণি। এই লেকের চারপাশেই ধীরে ধীরে কোদাইকানাল শহর বেড়ে উঠেছে। প্রায় দেড়শ বছর আগে এই লেকে প্রথম যে বোটটি ভেসেছিল সেটি আনানো হয়েছিল তুতিকোরিন থেকে। এখন এখানের অন্যতম আকর্ষণ বোটিং। আমরাও লেকের জলে নৌকা ভাসালাম। বেশ মেঘ ছিল তখন। হঠাৎ করে তা কেটে গিয়ে শহর দৃশ্যমান হয়ে উঠল। চোখে পড়ল শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কোদাইকানাল বোট ক্লাব, অভিজাত হোটেল কার্লটন ইত্যাদি। মেঘেরা আস্তে আস্তে আবার নেমে এসে প্রায় জল ছুঁইছুঁই যখন আমরা লেক থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পরবর্তী গন্তব্য কোয়েকার'স ওয়াক-এর দিকে রওনা দিলাম।

কোয়েকার সাহেব এখানে এসেছিলেন কোদাই এলাকার মানচিত্র তৈরি করতে। সে কাজ করতে গিয়ে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব খোলা অসাধারণ একটি ভিউ পয়েন্ট আবিষ্কার করেন যেখান থেকে উপত্যকার দৃশ্য অসামান্য সুন্দর। ১৮৭২ সালে তিনি ওই জায়গাটিকে বাঁধিয়ে একটি ১ কিমি লম্বা পায়েচলা পথের রূপ দিলে এটি তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে কোয়েকার'স ওয়াক নামে পরিচিতি পায়। প্রবেশমূল্য দিয়ে ওখানে ঢুকতেই সামনে দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ি নিসর্গ কিছুক্ষণের জন্য যেন বাক্যহারা করে দিল। দেখলাম নীলচে-বেগনি উপত্যকা, ঢেউখেলানো পাহাড়, গায়ে গায়ে ছোট ছোট গ্রাম, আঁকাবাঁকা পথরেখা, ইউক্যালিপটাস, বার্চ, পাইন বনানী আর তাদের ওপর ছায়া ফেলছে নিরন্তর মেঘেদের জমায়েত। ওই দৃশ্য ভালো করে উপভোগ করতে একটি টেলিস্কোপের ব্যবস্থাও আছে যা আমরা ব্যবহারের সুযোগ ছাড়লাম না। ওয়াকের একদিকে বসার জায়গায় কিছুক্ষণ বসতে মনে হচ্ছিল অ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে আছি আর সামনে প্রকৃতির প্যানোরামিক ভিউ-এর সবকিছুই আমার জন্য। নীল এবং বেগুনি রঙের মায়াঅঞ্জন যেন চোখে আঁকা হয়ে গেল, মন ভরে উঠল।

এই ভালোলাগা নিয়ে পর পর কোদাইকানালের আরও কয়েকটা দ্রষ্টব্য যেমন পিলার রকস, গ্রিন ভ্যালি ভিউ, সোলার অবজারভেটরি ইত্যাদি দেখে নিলাম। পিলার রকস একটি ভূতাত্ত্বিক বিস্ময় যেখানে ৪০০ ফুট লম্বা তিনটি সলিড গ্রানাইট বোল্ডার যুগ যুগ ধরে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। মেঘের মধ্যে দিয়ে যেটুকু দেখলাম কেন জানিনা আমার মনে হোল ছোটবেলায় পড়া অরণ্যদেব কমিক্সের হিজ ও হার্জ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, একটু বিশালাকৃতির এই যা। গা ঘেঁসে দাঁড়ানো এই তিনটি পিলারের বেস একটি ভয়ঙ্কর গুহা তৈরি করেছে যাকে ডেভিল'স কিচেন বলে। এখানে কমল হাসনের একটি বিখ্যাত সিনেমা 'গুনা'র শুটিং হওয়ার পর থেকে একে গুনা কেভ বলা হয়। এই কেভ সাধারণ টুরিস্টদের অগম্য, রোমাঞ্চ সন্ধানীরা প্রস্তুতি ও অনুমতি নিয়ে সেখানে অভিযান করতে পারেন। আমরা গুহাগর্ভে নেমে যাওয়ার পথটি দেখেই ক্ষান্ত হলাম।

গ্রিন ভ্যালি ভিউ হল উপত্যকার দৃশ্য দর্শনের আরেকটি সুন্দর জায়গা। পাহাড়ের গা থেকে প্রায় ৫০০০ ফুট খাদ নেমে গেছে অতলে। জায়গাটায় গিজগিজ করছে ভিড় দেখে আমরা পত্রপাঠ বেরিয়ে এসে অবজারভেটরিমুখো হলাম। কোদাইকানালের সোলার অবজারভেটরি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন মানমন্দির। সেই ১৮৯৫ সাল থেকে এখানে অ্যাস্ট্রো-

আছে কোদাইকানাল শহর। আমরা সেদিনের মত ঘোরা শেষ করে পরের দিনের জল্পনা করতে করতে হোটেলে ফিরলাম। পরদিন বেরিয়ে পড়লাম বিয়ার শোলা ফলস, পাইন বন, বেরিজাম লেক, দুটো পার্ক, মন্দির ইত্যাদির টার্গেট নিয়ে। সব যে দেখতেই হবে এমন কোনও মানে নেই, যতক্ষণ মন চায় প্রাণ চায় দেখা যাবে। তবে বিয়ার শোলা ফলস একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। শুনলাম ভালুক জল খেতে আসত এখানে তাই এই নাম। শোলা ফরেস্ট দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি অঞ্চলের এক বিশেষ ধরনের অরণ্য যা এই সব স্থানের বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শোলা অরণ্য ও তৃণভূমি দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্ছে! তবে এখানে গাড়ি থেকে নেমে ঝরনা অবধি পৌঁছনোর পথটি বড় সুন্দর। এখানেই প্রথম কুরিঞ্জি ফুল স্পর্শ করার সুযোগ হল। মনে হল তামিল সংস্কৃতি ছুঁয়ে দেখলাম।

কোদাইকানালের পাইন বন দেখলেই চেনা চেনা লাগবে। খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এই বন আপনি অসংখ্য বার দেখেছেন বিখ্যাত বা অখ্যাত বহু সিনেমায়। আসলে কোদাইকানাল ও তার আশপাশ বিজ্ঞাপন বা সিনেমার শুটিং লোকেশন হিসেবে দারুণ জনপ্রিয়। শুধু দক্ষিণি ছবি নয় হিন্দিও। যেমন "যো জিতা ওহি সিকন্দর" পুরোটাই এখানে তোলা কিন্তু দেখানো হয়েছে দেরাদুন বলে। তেমনি আবার কোদাইকানালের পাম্বার ফলস বিখ্যাত 'লিরিল' বিজ্ঞাপনের জন্য।

বেরিজাম লেক কোদাই শহর থেকে ২৩ কিমি দূরে সবুজ অরণ্যের মাঝে একটুকরো অনাবিল নীল নির্জনতা। এই হ্রদের বন্য সৌন্দর্য প্রথম দেখাতেই মন কেড়ে নেয়। পাইন কোন কুড়োলাম বেশ কিছু। এটি বনাঞ্চল দফতরের অধীনে বলে এখানে আসা অনুমতি সাপেক্ষ যা আমরা আগেই সংগ্রহ করেছিলাম। ফেরার পথে 'হ্যাটস অফ' পয়েন্ট বা 'ক্যাপ ফ্লাই' পয়েন্ট বলে একটি দারুণ ভিউ পয়েন্ট থেকে আবার নীল বেগুনি রঙের রায়ট দেখে মুগ্ধ হলাম। এখান থেকে নীচের দৃশ্য দেখতে গেলে মাথার টুপি পড়ে যাওয়া অবধারিত তাই এই মজার নাম। কোদাইকানালের প্রতিটি দ্রষ্টব্যের বর্ণনা এই পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। তাই পছন্দের কয়েকটির কথা উল্লেখ করে কাহিনিতে ইতি টানব। কোদাইকানাল গড়ে ওঠায় যেহেতু খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচুর অবদান তাই এখানে অসংখ্য চার্চ ও কনভেন্ট আছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হল লা সালেথ চার্চ যেখানে ভার্জিন মেরী পূজিতা। ১৮৬৫ সালে স্থাপিত এই চার্চটি ফ্রান্সের লা সালেথ চার্চের ফরাসি দেশের বাইরে একমাত্র শাখা। ১৮৪৬ সালে ফ্রেঞ্চ আল্পসের লা সালেথ বলে ছোট্ট একটি গ্রামে মা মেরী দুটি শিশুকে দর্শন দিয়েছিলেন। ক্যাথলিক বিশ্ব তাদের কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যান। পরে ওই গ্রামে একটি মঠ তৈরি করে মা মেরীকে "আওয়ার লেডি অফ লা সালেথ" নামে উৎসর্গ করা হয়। পরবর্তী কালে স্থান মাহাত্মের কারণে লা সালেথ ভুবন বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ফাদার ল্যুই নামে কোদাইকানালের একজন মিশনারি ট্রপিকাল ডিজিজে মরমর অবস্থায় "আওয়ার লেডি অফ লা সালেথ" কে মনপ্রাণ দিয়ে সুস্থতার প্রার্থনা করেন এবং অলৌকিক ভাবে মৃত্যু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি সুস্থ হয়েই লা সালেথের অনুরূপ একটি চার্চ প্রতিষ্ঠা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সংকল্পের প্রতিচ্ছবি কোদাইকানাল লা সালেথ মঠ। মানুষের বিশ্বাসকে সম্মান জানিয়ে এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে খুব ভালো লেগেছিল আমাদের।

আসি কুরিঞ্জি আন্দাভর স্বামীর কথায় যাঁর দর্শন ছাড়া কোদাই ভ্রমণ অসম্পূর্ণ। দেবতা মুরুগানের তামিল সঙ্গম বর্ণিত ছটি অধিষ্ঠানের প্রথমটি এই পালানি পাহাড়ে। সঙ্গম সাহিত্যে দাক্ষিণাত্য অঞ্চল পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং এই প্রতিটি অঞ্চলের অধিপতি ভিন্ন। কুরিঞ্জি হল পার্বত্য অঞ্চল, মুল্লাই অরণ্য, নেইথাল সমুদ্র তীরভূমি, মারুথাম শস্য ক্ষেত্র এবং পালাই অনাবাদি অঞ্চল। মুরুগান হলেন পার্বত্য অঞ্চলের আন্দাভর অর্থাৎ অধীশ্বর। কুরিঞ্জি ফুল তাঁর পরম প্রিয়। এই মুরুগান হলেন আমাদের কার্তিকেয়; জানতে আগ্রহ হয় নিশ্চয়ই তিনি দক্ষিণ দেশে এমন অবশ্য-উপাস্য হয়ে উঠলেন কোন পথে। সংক্ষেপে জানাই সে গল্প। নারদ একবার মহাদেবকে নিবেদন করেন 'জ্ঞানফলম'। তখন দেবাদিদেবের ইচ্ছে হয় দুই পুত্রের পরীক্ষা নিয়ে বিজেতাকে সেই জ্ঞান ফল উপহার দেওয়ার। তিনি বলেন যে আগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসবে তাকেই তিনি ফলটি দেবেন। এ কাহিনি আমাদের জানা যে কি ভাবে গণেশ মায়ের চারদিকে চক্কর কেটে আগে এসে জিতে যান। কিন্তু তামিল উপকথায় 'কাহানি মে টুইস্ট হ্যায়'। গণেশের নিপাতনে সিদ্ধ পথে জ্ঞানফল লাভ এবং পিতার সমর্থন পাওয়া দেখে বালক স্কন্দের অভিমান হয়। সেই সময় ব্রহ্মা মহাদেবের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। কার্তিকেয়র মনে কিছুদিন ধরেই একটি প্রশ্ন ঘুরছিল যে প্রণব মন্ত্রের অর্থ কী। তিনি তা ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইলে ব্রহ্মা শিশু জ্ঞানে তাকে 'তুমি বুঝবে না' বলে উপেক্ষা করেন। যুগপৎ এই দুটি ঘটনায় আহত হয়ে কার্তিক কৈলাস ত্যাগ করে দক্ষিণ দেশে চলে আসেন এবং প্রথমে অবস্থান করেন এই পালানি পাহাড়ে। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় তিনি জনজাতি কন্যা ভল্লির প্রেমে পড়েন। মুরুগান ও ভল্লির প্রেম দক্ষিণ ভারতীয় উপকথায় গাথায় কাব্যে বারবার উল্লেখিত। এখানে তারকাসুর বধের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারকাসুরের ভাই অত্যাচারী রাজা সুরপদ্মকে সংহার করে স্থানীয় মানুষকে রক্ষা করার কাহিনি। অথবা মহাদেবকে ওমকারের অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রসঙ্গ। মুরুগানের নানা কীর্তির সঙ্গে জড়িত যে ছটি স্থানের কথা সঙ্গম সাহিত্যে উল্লেখ আছে তাই আজ মুরুগান তীর্থ। পালানি তেমনই এক স্থান।

আমার। আমাদের 'ক্যালানে কার্তিক' দেখা চোখে দক্ষিণের কার্তিক সম্ভ্রম জাগায়, সত্যি সে যুদ্ধ ও প্রেমের দেবতা। মন্দিরে মুরুগানের প্রিয় কুরিঞ্জি গাছে ফুল ধরেছে। সেটা ছিল ২০০৬ সাল, আবার ফুটেছে তিন বছর আগে ২০১৮-য়! এখন আবার প্রতীক্ষা।

প্রজ্ঞা পারমিতা ভ্রমণ কাহিনি, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস লিখছেন বছর দশেক। মেডিক্যাল জার্নালিজম করেছেন 'বর্তমান' হাউসের স্বাস্থ্যপত্রিকায়। 'মাতৃশক্তি' ও 'জাগ্রত বিবেক' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে কলম ব্যবহার করে থাকেন।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

ফিনল্যান্ডের বসন্তে

সুপ্রিয় কুমার রায়

ফিনল্যান্ড -১

২৬/০৭/২০১৬ সকাল এগারটা চল্লিশে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হয়ে দিল্লি পৌঁছালাম দুপুর দুটো কুড়িতে। বাইরে বেরোনোর সময় জানতে পারলাম ট্যাক্সি আর অটো দুটোরই স্ট্রাইক। ওলা আর উবেরের বিরুদ্ধে। ওলা-উবেরের জন্য ট্যাক্সি-অটোর ব্যবসাতে সব জায়গাতেই টান পড়েছে। যাই হোক একটা গাড়ির ব্যবস্থা হল। চললাম হোটেলে। পরদিন সকালে প্লেন ছাড়বে। সোজা হেলসিঙ্কি।

সাড়ে দশটায় রওনা হলাম দিল্লি থেকে, হেলসিঙ্কি পৌঁছালাম ওদের সময় অনুসারে তিনটে পাঁচ মিনিটে অর্থাৎ ভারতের ঘড়িতে বিকাল পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিট। দিল্লি থেকে আফগানিস্থান ও মস্কোর আকাশপথ ধরে সোজা হেলসিঙ্কি।

বড় ছেলে সায়ক অপেক্ষা করছিল এয়ারপোর্টে। গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি ঝকঝকে আকাশ। যেদিকে তাকাই নীল আর নীল। সূর্যের আলো দেখে মনে হচ্ছে দুপুর দুটো। আগের বছর লন্ডন থেকে ফিনল্যান্ড এসেছিলাম, তখন শীতকাল। দেখেছিলাম বিকেল তিনটের মধ্যেই সূর্যদেব ঘুমিয়ে পড়তেন কিন্তু এখন শুনলাম ভোর চারটে থেকে রাত এগারোটা অবধি উনি জেগে থাকেন। আর বাকিটুকুও পুরো অন্ধকার হয় না, গ্রহণের সময়কার মতো আলো থাকে। গতবার শীতের সময় গাছের পাতা সব ঝরে গিয়েছিল, গাছের রঙ ছিল সাদা, প্রচুর বরফ পেয়েছিলাম। এবার সবুজ রঙের আস্তরণে সারা শহর ঢাকা পড়েছে। সত্যি সত্যিই নানা রঙের ফুল বলছে – ধন্য আমি মাটির পরে। গতবার ঘাসের রঙ ছিল সাদা আর এবার ঘাস তার নিজের রঙ ফিরে পেয়েছে। এখানে এখন গরমকাল। তাই রাস্তায় প্রচুর লোকজন দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। সবাই প্রাণভরে উপভোগ করছে সময়টাকে। এখানকার সামার আমাদের শীত আর বসন্তকাল। কাছেই ছেলের বাড়ি। পৌঁছে গেলাম বেশ তাড়াতাড়িই।

গতবার ছিলাম হেলসিঙ্কিতে এবার আছি এসপো-য়। হেলসিঙ্কির লাগোয়া এই শহরটা। একটা দিন শুধু ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলাম শরীরটাকে এখানকার জলহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। বিকেলে মিনিট পনের হেঁটে পৌঁছে গেলাম সমুদ্রের ধারে। সৈকত খুব একটা বড় নয়। বাচ্চারা সমুদ্রের জলে লাফালাফি করছে, ঢেউ নেই বললেই চলে। বালিতে রোদের মধ্যে অনেকেই শুয়ে আছে। এই সময়টা এখানকার লোকজন যতটা পারে শরীরকে রোদের মধ্যে রাখে কারণ শীতকালে সূর্যের আলো খুব কম সময়ের জন্য থাকে এবং তেজও থাকে অনেকটা কম। সমুদ্রের ধারের রাস্তায় জগিং করতে দেখলাম অনেককেই। এমনি করেই সময় বয়ে যাচ্ছিল। চমকে উঠলাম ঘড়ি দেখে। রাত দশটা বাজে অথচ বোঝার উপায় নেই সূর্যের আলো দেখে। মনে হচ্ছে পড়ন্ত বিকেল।

ফিনল্যান্ড -২

রাত্রে গরম গরম আটার রুটি, আলু-ফুলকপির তরকারি ও হাতে বানানো নাড়ু খেতে খেতে হঠাৎ ছেলের কাছে ওর বন্ধুর ফোন এল। আগামীকাল পিকনিকে যাবো কিনা? মালদা থেকে তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি এসেছে। সবাই মিলে একসঙ্গে যেতে চায়। আমরা তো সব ব্যাপারে হাত উঠিয়েই আছি। ঠিক হয়ে গেল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব কিছু খাবার নিয়ে। এখান থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে একটা চমৎকার পিকনিকের জায়গা আছে শুনলাম। জঙ্গল, লেক এবং ছোট পাহাড় - সবই আছে। জায়গাটার নাম নুউক্সিও (NUUKSIO)। তবে ওখানে রান্না করতে দেবে না, নিয়ে গিয়ে খাওয়া যাবে। ভোর ভোর উঠে কিছু খাবার বানিয়ে নিলেই হবে, আপাতত চললাম বিছানায়।

নুউক্সিওতে পৌছে দেখি ওরা চারজন পার্কিংয়েই দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের একটু আগে পৌঁছেছে। সকলে একসঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। পার্কিংয়ের এবং জঙ্গলে ঢোকার জন্য কোনও মূল্য দিতে হয় না। ভালই ভিড়। শনিবার সব ছুটি, তার ওপরে এখানকার সামার। দল বেঁধে সব বেরিয়ে পড়েছে আনন্দ উপভোগ করতে। অনেকের সঙ্গে জঙ্গলের রাস্তা ধরে এগোলাম। একটু এগোতেই নজরে পড়ল গাছের গায়ে লাল, নীল আর হলুদ রঙকরা তিনটে কাঠের টুকরো লাগানো আছে। যেহেতু মন সবসময় জানার মাঝে অজানাকে সন্ধান করে তাই জানতে চাইলাম ছেলের কাছে। ও বলল, এই জঙ্গলঘেরা পাহাড়ে অনেকগুলো ট্রেকিং রুট আছে। যাতে কেউ রাস্তা না হারিয়ে ফেলে তার জন্য এই ব্যবস্থা। লাল, নীল আর হলুদ রঙের আলাদা আলাদা কাঠের টুকরো জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন গাছে লাগানো আছে। রাস্তা চেনানোর জন্য। তাইতো! বেশ কজনকে দেখলাম পিঠে স্যাক, টেন্ট আর স্লিপিং ম্যাট নিয়ে যেতে। জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন রঙের মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। হঠাৎ নজরে পড়ল ছোট ছোট গাছে প্রচুর পাকা ব্লু বেরি। কোনদিন খাইনি তাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অরণ্যের অধিকার। তাকিয়ে দেখি আমি শুধু একা নয়, ওদেশের লোকও আছে। কয়েকটা মুখে পুরে আবার হাঁটতে লাগলাম। একটা রাস্তা সোজা উপরে উঠে গেছে আর একটা ডানদিকে গিয়েছে বেঁকে। ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম। ঝাউ আর ব্লু বেরি ছাড়া নাম-না-জানা গাছের সংখ্যাই বেশি। শুনলাম এটা নাকি ফিনল্যান্ডের জাতীয় উদ্যান। ছোটবড় মিলিয়ে তেতাল্লিশটা লেক আর জলাভূমি অনেকটা জায়গা দখল করে আছে। একদিক থেকে আরেকদিকে যাওয়ার জন্য জলের ওপরে কোথাও আছে ভাসমান সেতু, আবার এমনি সেতুও আছে। দূরে ছিপ নিয়ে একজনকে মাছ ধরতেও দেখলাম। লেকের জলে বেশ কিছু পরিযায়ী পাখি, দেশে যাদের দেখতে পাই শীতকালে। ওদিকে আর না এগিয়ে কিছুটা ফিরে এসে যে রাস্তাটা ওপরের দিকে গেছে সেইদিকেই হাঁটতে লাগলাম। ছোট পাহাড়। পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা অনেকদিনের এবং আনন্দেরও। তরতর করে উঠতে লাগলাম। কিছুটা উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেল।
পাইন গাছে ঘেরা সুন্দর একটা লেক। জলের উপর ভাসছে অসংখ্য পদ্মপাতা। লেকের পাশে তাঁবু খাটিয়ে একদল ছেলে মেয়ে আনন্দ করছে। কেউ কেউ আগুন জ্বালিয়ে খাবার গরম করছে। আগুন জ্বালানোর কাঠ এখানে বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে বেশ কটা টয়লেট বানানো। সকলের উদ্যোগে সবসময়ই পরিষ্কার। আমরা বাড়ির থেকে অভ্যাসমত বিছানার চাদর এনেছি তাই লেকের পাশে বিছিয়ে আড্ডা মারতে বসলাম। আর কাউকে অমনি চাদর পেতে বসতে দেখিনি। শুনলাম এই লেকের জল শীতকালে বরফ হয়ে যায়। তখন সবাই এর ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। চারদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে বিভিন্ন দলে সবাই আনন্দ করছে। আমাদের দেশের পিকনিকের মতোই। নেই শুধু মাইকের আওয়াজ। নির্ভেজাল আড্ডা, মনোরম পরিবেশ মাতিয়ে রাখল সারাদিন। সবাই নানারকম ভাবে আনন্দ করল অথচ জায়গাটা একটুও নোংরা হল না। এরাই কি শুধু দেশটাকে ভালবাসে!

ফিনল্যান্ড -৩

শনিবার হ্যানকো (Hanko) যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাদ সাধলো আবহাওয়া দপ্তর। জানালো সেদিন আকাশ থাকবে মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে রবিবারের আকাশ ঝকঝকে, বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। এখানে আবহাওয়া দপ্তরের খবর মোটামুটি মিলে যায়। তাই ঠিক হল রবিবার সকালে রওনা হয়ে রাত করে বাড়ি ফিরে আসব। হেলসিঙ্কি থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ একটি বন্দর শহর হল হ্যানকো। দুটো পরিবার সঙ্গে কিছু খাবার আর জল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সকাল সকাল। এসপো পার হতেই শহর ছাড়িয়ে পাড়ি দিলাম গ্রামের পথে। ঘন সবুজ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে উঁচুনিচু ঝকঝকে রাস্তা। আরো কিছুটা যাওয়ার পর দেখলাম দুপাশের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে চলছে চাষআবাদ। যেহেতু এখানকার জমি সমান নয়, ক্ষেতগুলিও নিচ থেকে বেশ কিছুটা ওপরে উঠে আবার নিচে নেমে গিয়ে আবার উঠেছে ওপরে। মিরিকের রাস্তায় চা বাগানের কথা মনে করিয়ে দেয়। অসাধারণ দৃশ্য। চোখ ফেরানো যায় না। দুঘন্টার ওপর লাগল হ্যানকো যেতে।

মানুষ শুয়ে আছে বালির ওপর। এসপোতেও একই জিনিস দেখেছি। সারা শরীরে রোদ লাগাতে ব্যস্ত এখানকার মানুষজন। সমুদ্রের ঢেউ নেই তাই জলের মধ্যেই বাচ্চাদের জন্য নানা ধরনের খেলার ব্যবস্থা করা আছে। বাচ্চারা তিন-চার ঘন্টার আগে কেউ জলের থেকে উঠছেইনা। বেশকিছু ছেলেমেয়েকে দেখলাম রাবারের নৌকাবিহারে মত্ত। স্থানীয় লোকেরাই গ্রীষ্মের সময়টা পরিবার নিয়ে সারাদিন সমুদ্রসৈকতে আনন্দ করতে ব্যস্ত। আমাদের মতো পর্যটকের সংখ্যা এখানে খুবই কম। সমুদ্রের মধ্যে বেশ কয়েকটা দ্বীপও দেখা যাচ্ছে। হ্যানকো ফিনল্যান্ডের এক নামকরা বন্দর। নানাধরনের ছোটবড় পালতোলা নৌকা দেখা যাচ্ছে বন্দর জুড়ে। মাঝে মাঝেই নৌকা নিয়ে সমুদ্রবিহারে নেমে পড়ছে এখানকার লোকজন। গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরোবার মতো আর কী!

সারাদিন শহরটা ঘুরে বেড়ালাম। সাজানোগোছানো সুন্দর একটা চার্চ দেখলাম। সমুদ্রের ধারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোলাপি রঙের জলমিনার। হ্যানকো থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চললাম আরেকটা গ্রামের দিকে। দুপাশে যবের ক্ষেত। গ্রামের বাড়িগুলো কী সুন্দর, ছোট ছোট বাংলোর মতো। কাঠের বাড়ি, মাথায় টিনের চাল। মাঝে মাঝে মনে হয় আগে থেকে পরিকল্পনা করে একটা দেশ তৈরি করা হয়েছে। সবকিছু জায়গামত। গ্রাম ছাড়িয়ে আবার পড়লাম জঙ্গলের মধ্যে। দুপাশে ঘন জঙ্গল। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি ছোট ছোট কয়েকটা বলগা হরিণশাবক রাস্তা পার হচ্ছে। এও এক বিরল অভিজ্ঞতা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা তখনও আকাশে রয়েছে সূর্যের আলো। আর সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে সবার চোখেমুখে। অকৃত্রিম এক আনন্দ!

ফিনল্যান্ড -৪

বাড়ির সামনে চারটে বড় বড় বাজার আছে যেখানে সব পাওয়া যায়। তিনটে বাজার ম্যলের মধ্যে ও আরেকটা এশিয়ান বাজার, কাছেই একটা বাড়ির নিচের তলায়। হঠাৎই এশিয়ান বাজারে একটা ভালো ইলিশ মাছ পাওয়া গেল। কালো জিরেও পাওয়া গেল ওই বাজারেই। গোটা সর্ষে আমরা দেশ থেকে নিয়ে এসেছি কিন্তু তেল? অনেক রকমের তেল আছে কিন্তু সর্ষের তেল পাচ্ছিনা। কাছাকাছি সব দোকান দেখা হল। কোথাও নেই। সর্ষের তেল ছাড়া ইলিশ মাছ ভাবতেই পারছি না। ছেলে বলল ওর অফিসের সামনে একটা ভারতীয় বাজার আছে। ওখানে খোঁজ করবে। মনে পড়ল গতবার ওখান থেকেই সর্ষের তেল এনেছিলাম। অবশেষে পরদিন পাওয়া গেল সর্ষের তেল। ফিনিসে ইলিশ খাওয়ার স্বাদ পূর্ণ হল।
ফিনল্যান্ডের ওপর দিয়ে উড়োজাহাজে আসার সময় জানলা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখছিলাম নীল জল আর সবুজ বন। পরে বুঝলাম নীল জল হল বাল্টিক সি সহ অসংখ্য লেক আর সবুজ বন হল সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অগুনতি গাছপালা। আমাদের দেশে শীতের পর আসে বসন্তকাল আর এখানে বসন্তের পরে শীত। সারা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ম্যাপল গাছ। সারা পৃথিবীতে প্রায় একশো পঁচিশ রকমের ম্যাপল গাছ আছে। বাড়ির সামনে যতগুলো ম্যাপল গাছ দেখেছি পাতার রঙ এখন ঘন সবুজ। শীতকালে সব পাতা ঝরে যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে নানা রঙে। বোঝা যাবে বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। লন্ডনেও গতবার এমনি শোভা দেখেছিলাম।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের এক নম্বরে। স্কুলের বাইরে এখানে টিউশনের কোনো দরকার নেই। ছেলেমেয়েদের বইয়ের ব্যাগ নিয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে যেতে এখানে দেখা যায় না। এখানে কাউকে পান-গুটকা খেতে দেখিনি। রাস্তাঘাটে, স্টেশনে, সমুদ্রসৈকতে কোথাও দেখতে পাইনি পানের পিক আর গুটকার দাগ।
বিকেলে এসপো থেকে ১৩২ নম্বর বাস ধরে চললাম হেলসিঙ্কি। যেহেতু এখানে বাঁদিকে গাড়ির স্টিয়ারিং তাই বাস ধরার জন্য আমাদের দেশের উল্টোদিকে দাঁড়াতে হয়। সামনের গেট দিয়ে এক এক করে সবাই উঠে ড্রাইভারের কাছ থেকে টিকিট কেটে ভিতরে যাচ্ছে। আর যাদের বাসকার্ড আছে তাদের গেটের মুখেই একটা ছোট মেসিনের সামনে কার্ডটাকে ধরতে হচ্ছে। বাসগুলো আমাদের দেশের এসি বাসের মত।

ফিনল্যান্ড – ৫
আমার ছোট ভাইয়ের বড় মেয়ে থাকে জার্মানি। ফিনল্যান্ডে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে আমাদের কাছে। তাই আবার ঠিক হল সৌমেনলিনা দ্বীপ যাওয়ার। ১৭ আগস্ট বিকালে সবাই মিলে অর্থাৎ আমি, স্ত্রী বেবি, সায়ক আর ভাইঝি মিষ্টু স্টিমারে করে চলে গেলাম 'সৌমেনলিনা দ্বীপ'। মুম্বাইয়ের 'গেট অফ ইন্ডিয়া' থেকে 'এলিফান্টা' যাওয়ার মত। স্টিমারে মিনিট কুড়ির মত লাগে।

ছোট্ট একটা দ্বীপ - চারিদিকে সমুদ্র তার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা জায়গা যেখানে তিন হাজার বছর আগেও মানুষ ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর হেরিটেজ লিস্টে এই দ্বীপের নাম আছে। আমাদের দেশের পাথরে বানানো দুর্গগুলোর মত এখানে চারিদিক ঘেরা একটা দুর্গ আছে। অনেকগুলি কামান সমুদ্রের দিকে মুখ করে রাখা যাতে জলপথে কেউ আক্রমণ করলে দুর্গকে বাঁচাতে পারে। ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক নিদর্শন এখানে দেখা যায়। যুদ্ধের জন্য বানানো দুর্গ। প্রচুর বাঙ্কার। ওপর থেকে দেখলে বোঝাই যাবে না। সৈন্যদের থাকার জায়গা। গতবার এসেছিলাম শীতের সময়। সমুদ্রের জলের রং ছিল নীল কিন্তু চারিদিক ছিল সাদা চাদরে ঢাকা। হালকা বরফের আস্তরণে ঢাকা ছিল সবকিছু। আর এখন চারিদিক সবুজে সবুজ। নানা রঙের ফুল এই ছোট্ট দ্বীপটাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। পাখির কলরবে মুখরিত সবদিক। অপূর্ব সুন্দর একটা জায়গা। পিকনিক করার পক্ষে আদর্শ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ফিনল্যান্ড বা জার্মানির লড়াইয়ের ইতিহাসে এই জায়গার অনেক ঘটনা আছে। মস্কো মাত্র ১০২০ কি.মি. দূর। যাইহোক ইতিহাসের আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে একটা সুন্দর চার্চ আছে। বেশ কয়েকটা রেস্তোঁরা ও একটা ছোট জাদুঘর আছে। তিন-চার ঘন্টা কাটানো কোনও ব্যাপারই নয়। নানা দেশীয় পর্যটকদের ভিড়।

আবার স্টিমারে চেপে ফিরলাম হেলসিঙ্কি। রাত্রে এখানকার সবথেকে বড় ভারতীয় রেস্তোঁরাতে খাওয়ার ইচ্ছা। নাম ইন্ডিয়া হাউস। আটটা নাগাদ ঢুকলাম ডিনারের জন্য। সুন্দর সাজানোগোছানো, একসঙ্গে একশোর বেশি লোক বসতে পারে। অপরিচিত গন্ডির মধ্যে পরিচিত মানে স্বদেশীয় কিছু মানুষ দেখে বেশ ভালো লাগছিল। আরো ভালো লাগল হিন্দি কথাবার্তা শুনে। মনে হচ্ছিল দেশেই আছি। বিদেশে এলে দেশীয় সব ভাষাই যেন আরও মিষ্টি লাগে। দেশ নিয়ে অনেক ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সমালোচনা করি ঠিকই কিন্তু বিদেশে আসলে দেশপ্রেম ভালই উপলব্ধি করা যায়। খাওয়াটা বেশ ভালই হল। টিপস দেওয়ার চল নেই এখানে, এমনকি ভারতীয় রেস্তোরাঁতেও। শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে এলাম ইন্ডিয়া হাউস থেকে।

ফিনল্যান্ড – ৬

শনিবার ২১/০৮/২০১৬ হেলসিঙ্কি থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য রওনা হলাম তালিন, ফিরলাম রবিবার রাত্রে। এবারও সেই বিশাল দশতলা জাহাজ। মনে হচ্ছিল একটা চলমান বড় পাঁচতারা হোটেল। কেউ কেবিন ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে, কেউবা ডেকে বসে আড্ডা দিতে দিতে, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় বসে সময় কাটাচ্ছে, কেউবা ক্যাসিনোতে। চারিদিকে অনেক টিভি লাগানো আছে। কয়েকজন দেখলাম ভিড় করে খেলা দেখছে। অলিম্পিকে জার্মানি আর ব্রাজিলের ফুটবল ম্যাচ। বার রয়েছে বেশ কয়েকটা। কোনটাতে হচ্ছে গান আর কোনটাতে নাচ। কিন্তু সবকিছুই চলছে সুশৃঙ্খলভাবে। সব মিলিয়ে দুই থেকে আড়াই হাজার লোক ধরে জাহাজটায়। অবাক লাগল যখন দেখি একটা রেস্তোঁরাতে খাবার ওজন করে বিক্রি হচ্ছে। প্রচুর আমিষ ও নিরামিষ খাবার রাখা আছে, পছন্দমত খাবার প্লেটে নিয়ে যেতে হবে ক্যাশ কাউন্টারে। খাবার সমেত প্লেটটা ওজন করার যন্ত্রে রাখতে হবে। দাম ১০০ গ্রাম ২০ সেন্ট, যে কোনও কোল্ডড্রিঙ্কস ১ ইউরো। আমরা ছিলাম সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মত। সব আনন্দই চেখে দেখছিলাম। পরিচ্ছন্নতা এদের মজ্জাগত। তাই সর্বত্রই ঝকঝকে তকতকে। আর পাবলিক টয়লেট আমাদের লজ্জা দেয়।

ভোরবেলা তালিনের মাটিতে পা রাখলাম। রবিবার ওখানের তাপমাত্রা তখন ২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। প্রথমবার এসেছিলাম

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নে। যদিও এখানকার শতকরা ষাটভাগ লোক রাশিয়ান ভাষাতেই কথা বলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জার্মানি আর সোভিয়েতের অনেক ইতিহাসবহনকারী এই তালিন। এবারেও আধুনিক তালিনের দিকে না গিয়ে মধ্যযুগীয় তালিন দেখতেই পছন্দ করলাম। বিশ্বের অধিকাংশ পর্যটকদের সঙ্গে পছন্দের মিল খুঁজে পেলাম। হাজার বছরের পুরানো শহর, বাড়িঘর – 'ফেয়ারি টেলস'-এর মত। মনে হচ্ছিল গল্পে দেখা রাজকন্যা থাকে, ওই সাত সাগর আর তের নদীর পারে। কোনও কোনও রেস্তোরাঁর সাজশয্যা, আসবাবপত্র সেই সময়টাকে ধরে রেখেছে। পার্লামেন্ট, বেশ কয়েকটা অপূর্ব সুন্দর চার্চ, ক্যাথিড্রাল দেখলাম। সবই মধ্যযুগীয় স্থাপত্য।

পর্যটকদের আনন্দ দেওয়া এবং সংস্কৃতির প্রচারের জন্য নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দুপুরে গতবারের মতই 'মহারাজা' নামে একটা ভারতীয় রেস্তোঁরাতে খেলাম। পরিচয় হল এক বাংলাদেশি যুবকের সঙ্গে, এখানে মাস্টার্স ডিগ্রির পড়াশুনো করছে আর অবসর সময়ে কাজ করে এই হোটেলে কাজ করে। সারা ইউরোপে অজস্র এইরকম ছেলেমেয়ে ছড়িয়ে আছে। উন্নত দেশগুলোর মত যে কোনও কাজের মর্যাদা আমরা কবে দেব?

ফিনল্যান্ড – ৭

আগে থেকেই ঠিক ছিল তাই শনিবার সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিলাম সবাই। খাবার খানিক খেয়ে আর খানিক নিয়ে পাড়ি দিলাম ওয়াইওয়াইতেরি সৈকতের (YYTERI BEACH) উদ্দেশে। আমরা যেখানে থাকি সেখান থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে। এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস ও বিয়ারের থেকে কেনা জলের দাম বেশি তাই জলের বোতল সঙ্গে রাখা ভাল। যেখান থেকে খুশি ভরে নেওয়া যাবে। শহর ছাড়িয়ে আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে চারিদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম গন্তব্যের দিকে। কখনও দুপাশে অরণ্য আবার কখনও শস্যক্ষেত। গান গাইতে গাইতে আর চারিদিকের শোভা দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ওয়াইওয়াইতেরি বিচে। প্রায় ছয় কিলোমিটার জুড়ে সাদা বালুর সৈকত। সমুদ্রের গর্জন বেশ দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল। হাওয়া চলছিল খুব জোরে। নীল জলের ব্যাপ্তি ছিল বিশাল।

মনে হচ্ছিল পৃথিবীর শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। প্রচুর পর্যটক। নানান অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আয়োজন। নীল আকাশ, তাতে টুকরো টুকরো মেঘের আনাগোনা, সামনে বিশাল নীল জলরাশি, সাদা বালুর চর, সমুদ্রের গর্জন – মন মাতিয়ে দিচ্ছিল সকলের। সমুদ্রের পাশে অনেক সুন্দর সুন্দর থাকার জায়গা আছে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা এখানকার ছোট একটা গ্রামে থাকার। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, বাড়ির মালকিন অপেক্ষা করছিলেন। পৌঁছতেই সব বুঝিয়ে হাতে বাড়ির চাবি দিয়ে চলে গেলেন। অনেকটা জায়গাজুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে কয়েকটা ঘর নিয়ে একটা বাড়ি। বাড়ি-সংলগ্ন জমির পর বিশাল ক্ষেত। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে আরো কিছু বাড়ি, দেশের গ্রামের মত। কিন্তু ঘরে আছে ইন্টারনেট, ট্যাপ ওয়াটার, ইলেকট্রিসিটি, মডুলার কিচেন, সুন্দর খাট, টিভি, রেফ্রিজারেটর – সবই যা শহরের বাড়িতে দেখা যায়। এখানে কোথাও খোলা নালা দেখা যায় না। তখনও আকাশে বেশ আলো, আমরা বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম দেখতে। দুপাশে ক্ষেত, তার মধ্যে দিয়ে ছোট রাস্তা। যে যার মতো ছবি তুলছি। এমনসময় এক ভদ্রলোক সাইকেল করে এসে জানতে চাইলেন আমরা কে এবং এখানে কেন এসেছি। প্রথমেই আমাদের মাথায় এল বোধহয় ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর কেউ। বললাম আমরা পর্যটক, গ্রাম দেখতে এসেছি। কী দেখে জানিনা উনি জানতে চাইলেন ভারতবর্ষ থেকে এসেছি কিনা, আমরা তো অবাক। ভালও লাগল যে ইউরোপের এক প্রান্তে এত দূরের একটা গ্রামের বাসিন্দা আমাদের দেশের নাম জানে। মনে মনে একটু গর্বিত হলাম। শুনলাম উনি মোবাইল ফোনে কাউকে বলছেন যে আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি। আমরাও ধরে নিয়েছি নির্ঘাত আই.বি.-র লোক। আমাদের সঙ্গেসঙ্গেই উনি ঘুরছেন আর সব বলে দিচ্ছেন। ক্ষেতের থেকে ফসল তুলে খেতে দিচ্ছেন। খুবই আন্তরিক বলে মনে হচ্ছে। আমাদের মতো কোনও পর্যটকদের এর আগে গ্রাম বেড়াতে দেখেননি। অনেকটা ঘুরে যখন ফিরে আসছি তখন দেখি রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে। মেয়েটি কৃষিবিদ্যা নিয়ে বাইরে পড়াশুনা করে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। ভবিষ্যতে ওর কৃষক হওয়ার ইচ্ছা। অনেক গল্প হল। শুনলাম জার্মান আর সোভিয়েতের যুদ্ধের কাহিনি। ভদ্রলোকের বাবা ওই যুদ্ধের একজন শহিদ। একটা শহিদবেদী দেখালেন। ওঁদের সঙ্গে বেশ কয়েকটা ছবি তোলা হল স্মৃতি হিসাবে। বুঝলাম উনি ওই গ্রামেরই লোক, অন্যকিছু নন। এই প্রথম কোনো বিদেশীকে এগিয়ে এসে আলাপ করতে দেখলাম। এর আগে অনেকের সঙ্গে হাসি বিনিময় হয়েছে বা একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি যেগুলোর মধ্যে ছিল লৌকিকতা, ছিল না এই অকৃত্রিম সরলতা। রাত্রে কিচেন ছেড়ে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হল। চারপাশে গোল হয়ে বসলাম। মনে হচ্ছিল ক্যাম্পফায়ার। আদিম মানুষের মতোঝলসানো খাবার খেতে খেতে খুশিতে মেতে উঠলাম। বাকিরা গান ধরল – রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে...

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে রওনা হলাম তুর্কু (Turku) – ফিনল্যান্ডের আগের রাজধানী। শহরের মধ্যে দিয়ে অরা (Aura) নদী বয়ে গেছে লন্ডনের টেমস নদীর মত। তবে অরা চওড়ায় টেমস-এর থেকে অনেকটাই কম। এখানে মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে তুর্কু ক্যাসল এবং তুর্কু ক্যাথিড্রাল অন্যতম।

ফিনল্যান্ড – ৮
যত জায়গা ঘুরলাম সর্বত্র পুলিশ আর ট্যাক্সির উচ্চারণ এক, বানান হয়তো আলাদা। আরেকটা ব্যাপার নজরে এসেছে। এখানে জানলায়, বারান্দায় কাচ লাগানো কিন্তু কোন গ্রিল বা লোহার শিক নেই। অনেক আগে সিকিমে এমনটা দেখেছিলাম। কিন্তু সেটা তো পাহাড়। চুরি, ছিনতাইয়ের কোনও গল্প এখানে নেই।
রবিবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলাম পার্ভো যাবো বলে। ফিনল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পার্ভো। অতি প্রাচীন এই শহরের পত্তন হয় ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে। শহরের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের জল প্রবেশ করায় জায়গাটা অনেকটা ভেনিসের মত লাগে। মধ্যযুগীয় শহরটা আবার অনেকাংশে তালিনের মত দেখতে। তবে তালিনের বাড়িঘর ছিল পাথরের তৈরি আর এখানকারগুলো কাঠের। এছাড়া দেখতে একইরকম। পার্ভো থেকে এসপো ফিরে গেলাম নোকিয়ার অফিস মানে এখন যেটা মাইক্রোসফটের অফিস দেখতে। 'নোকিয়ানভিরতা' নদীর পাশে মাইক্রোসফট বা নোকিয়ার বিশাল অফিস।
যানবাহনে ফিনল্যান্ডে আমাদের দেশের মতো অত শ্রেণিভাগ নেই। ট্রামে, ট্রেনে একটাই ক্লাস। যাত্রীসংখ্যা আমাদের দেশের থেকে অবশ্য অনেকই কম। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে জিনিস তুলতে বা পেরাম্বুলেটারে একদম ছোট বাচ্চাকে নিয়ে উঠতে এখানে কোনও কষ্টই হয়না, কারন সিঁড়িটা রাস্তার বা স্টেশনের প্লাটফর্মের সমান উচ্চতার। বয়স্কদের উঠতেও কোনও কষ্ট নেই। খোঁজ নিয়ে যেটুকু জানলাম তাতে এখানকার মানুষের মাসিক মাহিনার তারতম্য আমাদের দেশের মতো নয়। কম আর বেশির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য নাগরিকদের কোনো অর্থ দিতে হয় না। সব জায়গাতে হাসপাতাল, স্কুল এবং খেলাধুলো করার ব্যবস্থা আছে। রাস্তাঘাটে কোথাও পুলিশ নেই, অথচ সব কিছু নিয়ম ধরে চলছে। রাস্তায় কোনও কুকুর নেই। কেউ আবর্জনা ফেলেনা রাস্তায়, সবাই পরিষ্কার রাখে চারপাশটা। পথে থুতু ফেলা নৈব নৈব চ। এখানে বাইরে খুব ঠাণ্ডা, কিন্তু বাসে, ট্রেনে, ট্রামে, দোকানে, ঘরে সর্বত্র সাধারণ তাপমাত্রা, মানে ২১ থেকে ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর খাওয়ার জল সর্বত্রই একইরকম। জলের জন্য আলাদা কোনও ফিল্টার দেখলাম না। যেখান থেকে খুশি জল খাওয়া যায়। রাস্তাঘাটে গাড়ি, ট্রাম, বাস, মানুষের ভিড় সবই দেখলাম, কিন্তু কোনও গাড়ির হর্ন শুনতে পেলাম না। যেকোনও দূষণের ব্যাপারে এরা খুবই সচেতন। পরিবেশ সচেতনতা এদেশের সাধারণ মানুষের রক্তে মিশে গেছে।

ব্যাঙ্ককর্মী থাকাকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করার সুযোগ হয় সুপ্রিয় রায়ের। অসংখ্য মানুষের সান্নিধ্যে এসে নানা ঘটনার সাক্ষী হন যা তাঁকে লেখার জন্য রসদ যুগিয়েছে। যখনই সময় পেয়েছেন বেরিয়ে পড়েছেন অজানাকে জানতে দেশে-বিদেশে। লেখালেখি এবং ভিডিওগ্রাফিতে উৎসাহ থাকায় নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল খোলেন অবসরজীবনে। তাঁর কিছু রচনা বাংলার প্রখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ভ্রমণকাহিনি, বেড়ানোর ভিডিওর পাশাপাশি নিজের লেখার ওপর বানিয়ে ফেলেছেন পাঁচটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভাঙা মন্দিরের দেশ কাম্বোডিয়া

মলয় সরকার

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

পরদিন সকালে একবার বেরিয়ে পাব স্ট্রিটের আশেপাশে ঘুরে অল্প কিছু গিফট কিনলাম। ভাল বা নতুন কিছু নেই। সব চিনা জিনিস, সব জায়গাতে যেমন হয়।
এবার মেকং এক্সপ্রেস-এর বাসে চললাম বাটাম্বাং। বাসটি সুন্দর। বেশ পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক। শহর ছাড়িয়ে বেরোতেই সুন্দর রাস্তা। দুধারে সেই আগের মতোই, একই গ্রাম্য দৃশ্য – ধান খেত, পুকুর আর ছোট বড় গ্রামীণ ঘরবাড়ি, ঠিক যেন ভারতবর্ষ। রাস্তায় এক জায়গায় বাস দাঁড়াল চা খাওয়ার জন্য। এখানে চা খাওয়ার পরেই হঠাৎ এমন বৃষ্টি এল যে আর বাসে ওঠার জন্য যেতে পারছিলাম না । আমাদের এই দুরবস্থা দেখে দোকানের এক কাম্বোডিয়ান সুন্দরী এগিয়ে এল এক বিশাল ছাতা নিয়ে। এই স্বল্প পথটুকু পার করে বাসে তুলে দিয়ে গেল। ছোট ছোট কথা, ছোট ব্যবহার অনেক সময়ই মনে দীর্ঘ রেখাপাত করে। সেইরকম এইটুকু আতিথেয়তা মনে সুগভীর দাগ রেখে গেল।
হাইওয়ে ছাড়িয়ে অন্য রাস্তাতে ঢুকলে অবশ্য এখানকার রাস্তা আর ওখানের রাস্তায় কোন প্রভেদ নেই। বাস বিকেল বিকেলই পৌঁছে গেল বাটাম্বাং-এ। আগে থেকে বলা ছিল হোটেলে। ওরা টুকটুক পাঠিয়ে দিয়েছে। নাম লেখা কার্ড নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস থেকেই দেখলাম। আরও অন্য টুকটুকওয়ালারাও ভিড় করেছে বিভিন্ন হোটেলের নাম লেখা কার্ড নিয়ে।
হোটেলের নাম, পর ছে। নতুন হোটেল। মালিক ছেলেটিও কমবয়সী আর ভীষণ বিনয়ী। নাম চিয়াংসং। বলল, সে ইংরেজি খুব কম বোঝে। হোটেলে লোকজনও খুব বেশি দেখলাম না। চিয়াং বলল, নতুন খুলেছি তো, তাই এখনও বেশি প্রচার পায়নি। আস্তে আস্তে হচ্ছে। তাই বেশি লোকজনও রাখিনি। নিজেই সব করি। শুধু ঘর পরিষ্কার করার আর কাপড় কাচার দু-একজন আছে। যা লাগবে বলবেন আমি সবটাই দেখব। ওর ফোন নম্বরও দিল। বলল, এখানে সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি সব হোটেল, দোকান বন্ধ হয়ে যায়। তার আগে আপনাদের ভাল হোটেলে খাওয়ার জন্য নিয়ে যাব।
ঘরটা ভালোই, দোতলায়। সত্যিই নতুন। সাড়ে সাতটায় চিয়াং ওর গাড়ি করে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। সেটাতে জানাল খাবার শেষ। অন্য একটা হোটেলে খেয়ে ফিরলাম। সেখানে হোটেলের মালিক তো 'জো হুজুর' ভঙ্গীতে হাত জোড় করেই আছে। সবটাই থাই আর কাম্বোডিয়ান খাবার।
পরদিন সকালে টুকটুক নিয়ে একটি ছেলে হাজির। ছেলেটির নাম বায়ান, খুব হাসিমুখ আর চটপটে ছেলে। প্রথমেই নিয়ে গেল এখানকার জন্য একটা সিম কার্ডের ব্যবস্থা করতে। একটা দোকানে এক ডলারে এক সপ্তাহ কল আর ডাটা দিচ্ছে। নিয়ে নেওয়া গেল। শহরের মাঝখানটা ভালই, একটা পার্কের মতন রয়েছে সিটি সেন্টারে।

একটি খালের মত ছোট নদী বয়ে গেছে শহরের মাঝ দিয়ে। নাম সাংকেই। রক্তাভ লাল জল এবং বেশ খরস্রোতা । নদীর পাড় বাঁধানো এবং দুপাশেই লোকের শরীর চর্চার মতো ব্যবস্থা রয়েছে। সিটি সেন্টারের কাছটা বেশ সুন্দর দোকানপাট ইত্যাদি। রাস্তায় আসতে আসতে যেটা বেশ বেশি করে চোখে পড়ল, কাম্বোডিয়ান পিপলস পার্টির খুব রমরমা। বিশাল বিশাল জায়গা নিয়ে ঝাঁচকচকে অফিস। শহরের বাইরেটা নরেন্দ্রপুর কী সোনারপুরের মত অনেকটা। বায়ান প্রথমে নিয়ে গেল একটা বেশ অজ পাড়াগাঁয়ের মত জায়গায়। সেখানে একটা পরিত্যক্ত রেললাইন রয়েছে। তবে ভাল অবস্থায়। সেখানে দেখি, রেললাইনের ওপর চারটে চাকা দেওয়া একটা ট্রলিতে বাঁশের পাটাতন বিছানো রয়েছে। সঙ্গে একটি মোটর লাগানো রয়েছে। কিছু মাঝবয়সী ছেলে সেটিকে চালাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম না এটাতে দেখার কী আছে! এটার নাম নাকি 'ব্যাম্বু ট্রেন'।

আমি খড়্গপুরের রেল কলোনিতে মানুষ। ছেলেবেলায় এরকম ট্রলি অনেক দেখেছি এবং চেপেছি। এতে বোধ হয় সাত ডলার করে ভাড়া। ওরা ওই বাঁশের পাটাতনের ওপর বসিয়ে ৬ বা ৭ কিমি নিয়ে যাবে আবার নিয়ে আসবে। এরকম একটা গ্রাম্য ছেলেখেলা একটা জায়গার, বিদেশিদের এনে দেখানোর মতো কী আছে! ইচ্ছে হল না চাপার। ১৯৭৯ সালে একটা দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে আর আজ চল্লিশ বছর পরেও বিশেষ উন্নতি করেছে বলে মনে হল না। আমার কিন্তু সব সময়েই নিজের দেশের কথা মনে হচ্ছিল যে আমরা নিজেরা স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরেও কী এমন উন্নতি করেছি যে অন্য

এর পর গেলাম একটি খামারে যেখানে কুমীর চাষ হয়। ২ ডলার মাথাপিছু টিকিট নিল। কুমীরের ডিম ফোটানো থেকে শুরু করে বড় কুমীর পর্যন্ত এখানে রাখা রয়েছে। একটি গামলায় অনেকগুলো কয়েকদিন আগে ডিম ফোটা বাচ্চা রয়েছে।

তদারককারী মেয়েটি হাতে তুলে নিয়ে বাচ্চাগুলো দেখাচ্ছিল কী করে বালির নিচে ওরা ডিম রাখে। এখানে ঢোকার আগে বাইরে দেখেছিলাম কুমীরের ডিমের খোলার পাহাড়। কথায় কথায় বুঝলাম ওরা মালিক নয়, মালিক অন্য জায়গায় থাকে। এরা সব দেখাশোনা করার জন্য বেতনভুক কর্মী। এখানে প্রায় শদুয়েক এরকম খামার আছে। এখানে কেউ কুমীর খায় না, মারেও না। এগুলো চালান যায় ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ড, চিন প্রভৃতি দেশে। যেখানে কুমীরগুলো রাখা আছে তা খুব পরিচ্ছন্ন নয়। বেশ কয়েকটি বড় বড় চৌবাচ্চায় মোট বোধ হয় দু-তিনশো কুমীর নোংরা অল্প জলে গাদাগাদি করে মরার মতো পড়ে আছে।

রেলিংবিহীন সরু, দেখার জন্য যে জায়গা করা আছে তার ওপর দাঁড়িয়ে ভয়ই লাগছিল যেকোনো মুহূর্তে একটু পা পিছলে পড়ে গেলেই বুভুক্ষু কুমীরদের খাদ্য হতে সময় লাগবে না। কুমীরদের এরা মাসে তিনবার খাবার দেয়। বাইরে কুমীরের চামড়া আর মাংসের নাকি খুব কদর। আমাদের দেশেও বেশ কয়েকটি কুমীর প্রকল্প আছে।
এখান থেকে গেলাম ওয়াট এক নম-এ। এটি একাদশ- দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি, মূল প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে সামনে। এটি ইন্দোচিন বৌদ্ধ স্থাপত্যের। পুরনো মন্দিরটি প্রায় আংকোরভাটের সমসাময়িক। এখানে উঠে দেখা গেল না। সেটি কিন্তু একটি হিন্দু মন্দির। আজ অনেকখানিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। অল্প কিছু অস্তিত্ব বাকি আছে যা দেখে প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

এর পাশেই রয়েছে এক বিশাল বুদ্ধমূর্তি, কিন্তু যত্নের অভাবে বিবর্ণ। এখানে দেখলাম বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও তাদের পুনর্ব্যবহারের জন্য বিশাল বিশাল জালা এবং ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা। এর সামনেই আছে একটা দীঘি যা পদ্মফুলে ভর্তি, তবে চিনে যেমন পদ্মফুল দেখেছিলাম অত বড় নয়। এই মন্দিরটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরি, কিন্তু মাত্র নশো বছরের মধ্যে

অবহেলিত থাকার জন্য কিভাবে একটা কীর্তি নষ্ট হতে পারে তার চরম নিদর্শন। অবশ্য শুধু এটা কেন সিয়েম রিপের বেশির ভাগ মন্দিরই তো তাই। বুদ্ধমূর্তিটি দেখে মনে হচ্ছে, এটি একটি ঘরের মাথায় বসানো।

এখান থেকে মাঠের ধার দিয়ে গেলাম চারিদিকে সবুজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলা দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ওয়াট সামরুং নং বা চালু কথায় 'কিলিং ফিল্ড'-এ। এখানে একটি বৌদ্ধমন্দির আছে যা সাধারণত পালা-পার্বণে খোলে। এটি ১৭০৭ সালে চফা বেন নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী স্থাপন করেন ধর্মচর্চা করার জন্য। তারপর ১৮৮৭ সালে তুদং চে নামে এক সন্ন্যাসী সমস্ত মৃত সন্ন্যাসীদের অস্থির ওপর পাশেই একটি ইটের স্তুপ বানান।

এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল কাম্বোডিয়ার জীবনে এক ভয়ংকর অভিশপ্ত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। খমের রুজ সরকার দখল নিয়েছিল দেশের। তারা ১৯৭৬ সালে এই ধর্মচর্চার শান্ত জায়গাকে বেছে নিয়েছিল জেলখানা বানানোর জন্য। উপাসনার স্থানগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল শিশু ও নারীদের জেলখানা হিসাবে। বিচার ও হত্যা চলেছিল নির্বিবাদে। হিসাব বলছে প্রায় ১০,৪০০ নারীপুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল এখানে। পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালে এই রাজত্ব শেষ হলে তখন যা দেহাবশেষ পাওয়া যায় তা মানুষকে দেখানোর জন্য রাখা হয়। সে জায়গাটির নাম 'দি ওয়েল অফ শ্যাডোস'। সেখানে শুধু মাথার খুলি আর অস্থি ভর্তি। দেখে ও তার বর্ণনা পড়ে গা শিউরে উঠছিল।

আজ সেই স্মৃতি সৌধের গায়ে লেখা আছে, 'ব্যক্তিগত ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি কে বা কারা এটা করেছিল। তাই কাউকে আলাদা ভাবে শাস্তি দেওয়া যায়নি। আজ আর সেকথা ভেবে লাভ নেই। বরং যত তাড়াতাড়ি সে সব কথা ভুলে নতুন কাম্বোডিয়া গড়া যায় তার চেষ্টাই করা হোক।'

জানিনা এটাই ঠিক, নাকি হিটলারের নাৎসি বাহিনির সঙ্গে যুক্ত ছিল যারা তাদের শেষ জীবিত মানুষকেও শাস্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা, কিংবা বাংলাদেশে সেদিনের যারা রাজাকার ছিল তাদের ফাঁসি দেওয়া কোনটা ঠিক। অবশ্য বৌদ্ধধর্মে ক্ষমারই বেশি আধিক্য। তাই সেই দর্শন অনুযায়ী হয়ত এটাই ঠিক।

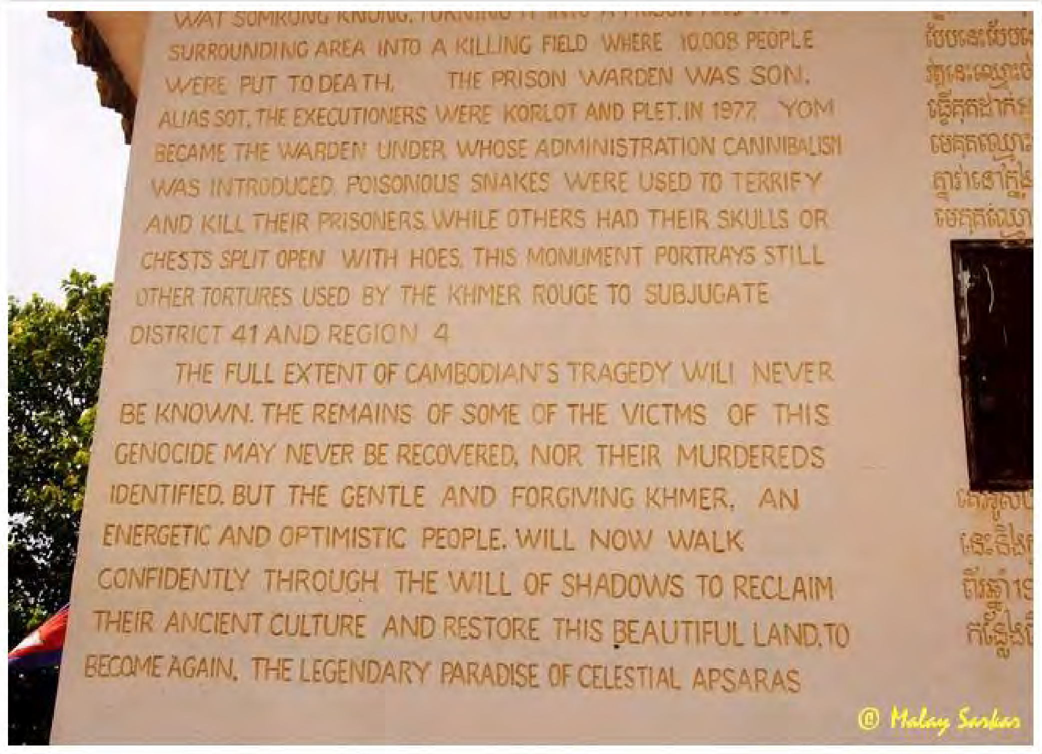

এখান থেকে একটা রক্তাক্ত স্মৃতি নিয়ে চললাম টুকটুকে চেপে গ্রামীণ রাস্তার ধার দিয়ে, এ বাড়ির পাশ দিয়ে ও বাড়ির বাগান ছুঁয়ে গ্রামের হাফপ্যান্ট পরা ছেলেদের খেলা দেখতে দেখতে। তারপর বায়ান নিয়ে গিয়ে হাজির করল একটা বাড়িতে, আমাদের দেশের, বিশেষ করে আসামের গ্রামের বাড়ি যেমন হয় সেরকম। মোটেই কেতাদুরস্ত বা ঝাঁ-চকচকে নয়। সেখানে ওদের ঘরোয়া কায়দার চালের পাঁপড় তৈরি হচ্ছে কেমন করে সেটা দেখাতে। এই চালের পাঁপড় ওরা সবজি বা মাছ কী মাংস মুড়ে রোল করে খায়। দেখলাম ঘরোয়া মেয়েদের হাতের কেরামতি। মেশিনপত্তর বিশেষ কিছু নেই সবটাই হাতে তৈরি।
সারথি তার রথে চড়িয়ে চষা মাঠের ধার দিয়ে, গ্রামের মেঠো পথের পাশ দিয়ে নিয়ে গেল এক ওয়াইনারিতে, ছোট্ট মদ তৈরির কারখানা। এদের নিজেদের আঙুর গাছগুলি এখন ছাঁটছে। এখানে অন্য জায়গা থেকেও আঙুর আসে। একটা ছোট কাউন্টারে এখানে তৈরি সামগ্রী সব বিক্রী হচ্ছে। এগুলো দর্শনীয় হিসাবে এতই নগণ্য যে দেখতে আগ্রহ হচ্ছিল না। তবু, ভাবছিলাম, সবই দেখা উচিত। কারণ এই গরীব দেশের যদি আর কিছু না থাকে সেটা তো ওদের দোষ নয়। ওরা অতিথিকে ওদের সম্পদ যা ওরা ভাল মনে করে তাই দেখাচ্ছে। তবে তাতে তো ওদের লজ্জা নেই। সেই ছেলেবেলার কবিতার লাইনটা মনে পড়ল, 'সজ্জাহীনের লজ্জা নাইকো, দারিদ্র্যে নাই ভয়'।
এখান থেকে যাওয়া হল ওয়াট বানান-এ। এটি একটি খুব প্রাচীন বুদ্ধ মন্দির এবং অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর। নিচের থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। প্রায় তিনশো সিঁড়ি আছে এখানে।

সিঁড়ির শুরুতে যেমন সব জায়গায় থাকে, রেলিং-এর মুখে দুটি নাগের মাথা রয়েছে। আর সামনেই রয়েছে একটি ঝিল। তার মধ্যে অনেকগুলি খুঁটির ওপর বাড়ি আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা ও লোকজন সব ঝিলের মধ্যে ছোট ছোট নৌকো করে যাতায়াত করছে, যেমনটি করে কাশ্মীরের ডাল লেকে। মন্দিরটি যথেষ্ট বড় এবং বেশ প্রসিদ্ধ। এটি তৈরি করেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে রাজা সপ্তম জারবর্মন। এর কারুকার্য ও বিশালতা সত্যিই দর্শনীয়। নিচে, সিঁড়িতে ওঠার মুখে খেলাম সেই বিশাল বড় ডাব যা একটা খেলেই পেট ভরে যায়। কী তার স্বাদ, কত জল আর কী সুন্দর শাঁস – মুখে লেগে আছে।
পরদিন গেলাম ব্যাট কেভ দেখতে। দূরে সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তার আগে আ-পাহাড় বিস্তৃত সবুজ গালিচার মত ধানের জমি। তার ওপর ঝলমলে সূর্যের নরম আলোয় এক অপূর্ব শোভা খেলা করে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেন কোনো সবুজ সমুদ্রে আলোছায়ার তৈরি চঞ্চল মাছের ঝাঁক পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

বদুপাশে এই কচি সবুজের সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একসময় পৌঁছে গেলাম ব্যাট কেভে। এরপরে আর টুকটুক যাবে না। গাড়ি নিতে হবে। এখানে দর্শকদের বসার জন্য অনেক চেয়ার রয়েছে যাতে তারা বসে অপেক্ষা করে কখন সন্ধ্যা

দেখা যাচ্ছে তার থেকে বেরোবে, সেই দৃশ্য দেখবে। অপেক্ষা করার যখন ব্যাপার আছে, অতএব সামনেই চা, জলখাবারের দোকানও আছে। পাহাড়ের গায়ে বিশাল এক হাঁ-এর মতো গুহা, তাতে ওঠা যায় না। নিচু থেকেই দেখতে হবে। আর সামনে এক বিশাল বোর্ডে সরকারের তরফ থেকে লেখা রয়েছে, এই চামচিকেদের কোন ক্ষতি না করতে, কারণ এরা পোকা খেয়ে এত ফসল বাঁচায় যে দেশের অর্থনীতিতে তার বিশাল সুফল ফলে। এরা মূলতঃ সন্ধ্যার আগে আগেই বের হয়, কারণ দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। ঠিক পুরো ঝাঁকটা দেখতে পেলাম না। বিচ্ছিন্নভাবে অল্পস্বল্প কিছু বেরোচ্ছিল। যখন পুরো ঝাঁক বাদুড় একসঙ্গে বেরোয়, তারা ঠিক, সমুদ্রের ছোট মাছের ঝাঁক যেমন বিভিন্ন দিক পরিবর্তন করে ঘোরে এবং অদ্ভুত এক জ্যামিতিক ছবি তৈরি করে, তেমনই সন্ধ্যার কালচে নীল বা লালচে আকাশের পটভূমিতে কালো বিন্দু বিন্দু চামচিকের দল সুন্দর উড়ন্ত দেখার মত ছবি তৈরি করে। বেশ খানিকক্ষণ ধরে ওরা এই প্রদর্শনী করে।
এর পর আর টুকটুক এগোয় না। ছোট এক টিলার মত পাহাড়ে উঠতে হবে যেটা অন্য জিপসি গাড়ির মত শক্তপোক্ত গাড়ি যাবে। আমাদের টুকটুকের চালকই ডেকে আনল একটা গাড়িকে। সবই তো ওদের চেনাশোনা লোক। যাই হোক গেলাম, এছাড়া তো আর উপায়ও নেই, অবশ্য তরুণ ছেলে মেয়েরা বা যাদের কাছে একটু বেশি সময় ও শক্তি আছে তারা হেঁটেও যাচ্ছে। ওপরে দু-তিনটি মন্দির আছে আর রয়েছে এক বীভৎস স্মৃতি নিয়ে জেগে থাকা কিলিং কেভ। এখানে একটি প্রাকৃতিক গুহা রয়েছে, ওই স্ট্যালাগমাইটের তৈরি বা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তৈরি। এতে নামা যায় কিছুটা। এর ওপরে যে ফুটো আছে তার থেকে হতভাগ্য মানুষদের, শিশু নারী নির্বিশেষে, নিচে ফেলে দেওয়া হত। পড়ার সময় পাথরে মাথা ফেটে বা আঘাতেই তারা মারা যেত। এখানে দুটো আলাদা কাঁচের আধারে শিশু ও বড়দের খুলি, হাড় আলাদা করে দেখার জন্য রাখা আছে। চোখের সামনে সেদিনের সেই দৃশ্যটা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। থাকতে পারলাম না বেশিক্ষণ।
বাইরে বেরিয়ে একটু ওপরে উঠে দেখলাম বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ওপরের মন্দিরটাতে অনেক বাঁদর ও তাদের দুষ্টুমি দেখে মনটাকে একটু সুস্থ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এখান থেকে পরদিন বাসে নমপেন যাওয়া হল। বাসটা ছোট তবে আরামদায়ক। মাত্র আট-ন জনের বসার মতো বাস।
রাস্তায় যেতে যেতে কাম্বোডিয়ার গ্রাম শহর একে একে পথেই পড়ে থাকছিল, এগিয়ে চলেছিলাম সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সঙ্গী করে। ছবির মত পেরিয়ে যাচ্ছিল তাদের হাসি-কান্না, স্কুলের ছেলেদের পড়তে যাওয়া, জেলের মাছ ধরা আর বড় বড় পার্টি অফিসের ইমারত। মাঝে খুব কম জায়গাতেই থামছিল এই বাস, কারণ এটি মেকং এক্সপ্রেসের বাস এবং বাটাম্বাং থেকে নমপেনই এর গন্তব্য। সব যাত্রীই নমপেন যাবে। নমপেনের হোটেলে বলে রেখেছিলাম যে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছালে যেন ওরা আমাদের হোটেলে নিয়ে যায়।
হোটেলে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রিসেপসনের ছেলেটি বলল, ও নাকি কোলকাতা থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে এসেছে। শুনে ভাল লাগল। হোটেলটি বেশ ভালো। শহরের একেবারে মাঝখানে, নতুন, ঝাঁ চকচকে পাঁচতলা হোটেল। খোলা ছাদে রেস্তোঁরা। নিস্তব্ধ কালো আকাশের নিচে গরম গরম খাবার খেতে খেতে গাছ দিয়ে সাজানো রেস্তোঁরার চেয়ার থেকে চারধারের নিয়ন জ্বলা নমপেনকে একটা আঁকা ছবির মতো মনে হচ্ছিল।
আমরা যেদিন নমপেনে ঢুকলাম তার পরের পরদিনই ছিল এখানে সাধারণ নির্বাচন। রাতে বেশ কিছু লোককে বাইকে ও গাড়িতে ঝাণ্ডা লাগিয়ে যেতে দেখলাম। ভাবলাম, খেয়েছে রে! হাতে গোনা দিন এখানে ঘোরার। যদি নির্বাচনের জন্য বন্ধ থাকে বা কোনও জায়গায় ঘোরা বন্ধ হয় তাহলে পুরো ক্ষতি। যদিও লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই তবু আমরা তো ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। ভোট মানেই বুঝি মিটিং, মিছিল, বনধ্,

ঝাণ্ডা নিয়ে বাইক, সাইকেলে হাজির। বক্তা বক্তৃতা শুরু করলেন। আমি ভাবলাম এই রে, দিনটা গেল। কী আশ্চর্য! বেলা আটটার সময় সব মিটিং শেষ। রাস্তা ফাঁকা, কে বলবে একটু আগে অত মানুষ এখানে ছিল! শহর একেবারে স্বাভাবিক।
তারপর সারা দিন চুপচাপ। কেবল চকের রাস্তার পাশে বড় বড় জায়ান্ট ডিজিটাল স্ক্রিন টাঙানো রয়েছে। তাতে কিছু আলোচনা বক্তৃতা চলছে আর অল্প কিছু মানুষ সামনের চেয়ারে বসে আছে। গোটা শহরে আর কোথাও কিছু চোখে পড়েনি। পরের দিন অর্থাৎ নির্বাচনের দিনও কিছু লক্ষ্য করিনি।
হোটেলের কাছেই নরোদম বুলেভার্ড ও শিহানুক বুলেভার্ডের সংযোগে দাঁড়িয়ে আছে আংকোরীয় ধাঁচে নির্মিত ইনডিপেন্ডেন্স টাওয়ার। এটি ১৯৫৮ সালে তৈরি হয়েছিল ফরাসীদের হাত থেকে কাম্বোডিয়ার ১৯৫৩ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে।

রাত্রিবেলা সবুজ ঘাসের কার্পেটের মাঝে আলো ঝলমল টাওয়ারটি সত্যিই মন কেড়ে নেয়। বহু মানুষ সন্ধ্যাবেলা এখানে বেড়াতে আসেন, গল্প করতে, সময় কাটাতে। ওইদিন এসেই সন্ধ্যাবেলা একবার বেরিয়েছিলাম এখানটায় হাঁটতে। শান্ত স্নিগ্ধ আলো অন্ধকারে একটা মায়াবী রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।
পরদিন প্রথমেই গেলাম রাজবাড়ি দেখতে। হোটেলের কাছেই হাঁটা পথেই যাওয়া যায় রাজবাড়ি। বেশ চড়া ই-টিকিটের দাম। ঠিক মেকং নদীর ধারে রিভারফ্রন্ট পার্কের সামনে। অনেক সিকিউরিটি পেরিয়ে তো ঢুকলাম ভিতরে। হঠাৎ ঢুকে পড়লে যেন চমকে ওঠার মত।

রাজবাড়ি বলে মূল যে প্রাসাদটাকে সেটা খুব যে বড় তা নয়। তবে বৈচিত্র্যে এটাকে মন্দিরই বলা হোক আর প্রাসাদই বলা হোক, ধরণ সেই একই, অনেকগুলো ছুঁচোলো চূড়াওয়ালা স্থাপত্য। দেখে বুঝলাম না রাজকার্য ছাড়াও তো রাজাদের থাকার জায়গা কিছু থাকবে তো, যেমনটি আছে ব্যাংককে, চিনে বা অন্যত্রও দেখেছি। হয়তো এখানেও আছে, জনতার জন্য তা দর্শনীয় নয়। তবে এটা খুব পুরনো রাজবাড়ি নয়; বর্তমান রাজার ঠাকুর্দার বাবা ১৮৬৬ সালে এটি অনেক জ্যোতিষশাস্ত্র মেনে তৈরি করেছিলেন। বেশ গাছপালা দিয়ে সাজানো চৌহদ্দিটা। আর রাজবাড়ির রঙ এখানকার রীতি অনুযায়ী লাল হলুদ সোনালির আধিক্যে সাজানো। পাশেই আছে একটি থ্রোন হল বা সিংহাসন ঘর। মাঝে একটা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা উত্তরদিকের একটি বড় চৌহদ্দিতে আছে সিলভার প্যাগোডা।

প্যাগোডা মানেই বুদ্ধমূর্তির মন্দির। প্যাগোডার সিঁড়িগুলো দামী ইটালিয়ান মার্বেলে তৈরি। ভিতরের মেঝে প্রায় ছয় টন রুপো দিয়ে তৈরি। এখানে ভিতরের বুদ্ধমূর্তি হল 'এমারেল্ড বুদ্ধ"। তাতে কত হিরে মুক্তো সোনা দানা আছে সে আর নাই বা বললাম। আরো কয়েকটি পূর্বতন রাজা রানির স্মৃতিসৌধ আছে। আর আছে পাশেই একটি আংকোরভাটের মডেল। প্যাগোডার দেওয়ালে রয়েছে রামায়ণ ও বুদ্ধের জীবনী অনুসরণে ফ্রেস্কো।

এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম আরেকটা প্যাগোডা দেখতে। এটি শহরের মাঝেই তবে একটু উঁচুতে। চারধারে বেশ পার্কের মত করা আছে। ভেতরে ছোট-বড় নানা বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। ভেতরটা বেশ জমকালো করে সাজানো। মন্দিরে ওঠার মুখেই রয়েছে দুটি বড় সিংহ মূর্তি।

চলে এলাম আবার রাজপ্রাসাদের বাইরে সামনে মেকং নদীর ধারে, যেখানে মিশেছে মেকং ও সিয়েম রিপ থেকে আগত টোনলা স্যাপ। রাস্তাটির নাম সিসোওয়াথ কোয়ে। এটি নদীর ধার বরাবর, হেঁটে চলার মতো সাজানো সুন্দর রাস্তা। অনেকটা আমাদের গঙ্গার ধারে যেমন আছে বা সাধারণত নদীর ধারে যেমন হয়। বহু লোক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যই হোক বা ভালো লাগার জন্যই হোক, নদীর ধারে বেড়াতে আসে, আড্ডা মারে। নদীর পাশে বেড়ানোর রাস্তা, তার পাশেই বড় রাস্তা সিসোওয়াথ কোয়ে।

পাশে বেশ অনেকটা ফাঁকা মাঠ, যেন গড়ের মাঠের ছোট সংস্করণ আর তার পাশেই রাজবাড়ি। সবমিলিয়ে জায়গাটা বেশ ভালো বেড়ানোর পক্ষে। অনেকে খাবার-দাবার, বসার সতরঞ্চি, আর ছেলে-মেয়ে, বল-র‍্যাকেট সব নিয়ে এসেছে, সবার সঙ্গে ছুটির দুপুরটা কাটাতে বলে। নদীর ধারে নানা রকমের ফল, চাট, ঠেলাগাড়ি, ভিখারি সব আছে। আমার তো কলকাতা

হচ্ছে, বুড়ো-বুড়িরা বসে শুনছে। এক জায়গায় দেখলাম, একটা বুদ্ধমন্দিরের সামনে অনেক ভিড়, অনেকে পদ্মফুল দিয়ে পুজো দিচ্ছে। পাশেই পদ্মফুল বিক্রি হচ্ছে। আর একটা মজার ব্যাপার দেখলাম, কয়েকজন পাখিওলা মন্দিরের সামনে খাঁচায় করে খুব ছোট ছোট চড়াই পাখির মতো পাখি অনেক বিক্রি করছে। লোকে কিনছেও খুব। পাখিওলা খাঁচার থেকে পাখিটা বের করে লোকের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। লোকে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করে পাখিটা উড়িয়ে দিচ্ছে। পাখিগুলো একটু উড়ে আবার কাছের ছোট গাছে বা নদীর ধারে এসে বসছে। এদিকে কয়েকটি ছেলে হাতে একটি লম্বা লাঠি নিয়ে ঘুরছে। লাঠির আগায় বোধ হয় আঠাজাতীয় কিছু লাগানো আছে। বোকা পাখিগুলো কিছু খেয়াল করছে না। ছেলেগুলো লাঠির আগাটা পাশ থেকে চুপি চুপি পাখিটার গায়ে ঠেকিয়ে দিচ্ছে আর পাখিটা আটকে যাচ্ছে লাঠিতে। ওরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার খাঁচায় রাখছে। পাখিটা আবারও বিক্রি হচ্ছে। অবাক হয়ে এই মজার ব্যাপারটা দেখলাম।

এখান থেকে ফেরি যাচ্ছে উলটোদিকের দ্বীপটাতে বেড়ানোর জন্য বা স্থানীয় লোকেদের নানা কাজে। ওপাড়ে হোটেলও রয়েছে বেশ বড় বড়। যেখানে মেকং আর টোনলা স্যাপ এসে মিলেছে সেই জায়গাটা বেশ চওড়া। আমরা যদি নমপেন আসতাম সিয়েম রিপ থেকে, তাহলে এখানেই এসে উঠতাম। কয়েকটা বড় লঞ্চ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম।

পরদিন প্রথমেই ভোর ভোর উঠে নদীর ধারে হাঁটতে গেলাম। বেশ ভালো লাগল, খুব ভিড় নেই - বেশ পরিচ্ছন্ন। তারপর সকালের দিকে সেন্ট্রাল মার্কেটে গেলাম। অনেকটা আমাদের নিউ মার্কেটের মতো। এখানে ইলেকট্রনিক জিনিস, সবজি মাছ, মাংস, ফল সব পাওয়া যায়। তবে বাজারটা চৌকো বা লম্বা নয়, গোল। এক এক দিকে এক একটা উইং, সেইমত এক এক দিকে এক এক জিনিস বিক্রি হয়। ভালোই গুছোনো বাজার। তবে আমাদের কেনার মতো কিছু ছিল না।

এখানকার হত্যাকাণ্ডের কথা পড়ে আর শুনে এবং কিছুটা বাটাম্ব্যাংএ দেখে এমন বিরক্তি, ঘৃণা এবং বিবমিষার উৎপত্তি হয়েছিল যে আমরা এখানকার দুটো দ্রষ্টব্যস্থান টুয়োল স্লাং ও জেনোসাইড মিউজিয়াম দেখতে গেলাম না। এই জায়গাগুলোতে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত যে হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের মাথার খুলি-অস্থি সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেই অন্ধকারময় ইতিহাসকে স্মরণে রাখার জন্য। ভাবছিলাম কোথায় নেই এই জিনিস, পোল্যাণ্ডে আউসউইৎজ, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে কুটনা হোরাতে, প্যারিসের ক্যাটাকম্ব, পূর্ব পাকিস্তানে, চিনে। কোথাও এগুলো আজও প্রকাশ্যে আনা হয়নি আবার কোথাও হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষেও এরকম অনেক আছে। সভ্যতার ও রাজনৈতিক শক্তির বিজয়রথ নির্বিচারে সাধারণ অসহায় মানুষের রক্তের ওপর দিয়েই যুগ যুগ ধরে এভাবেই এগিয়ে চলেছে।

পরিবর্তে স্থানীয় ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। মিউজিয়ামটি ছোটর ওপর বেশ ভালোই। সুন্দর গাছগাছালিতে সাজানো। এখানে ঘোরা বেড়ানোর কোন সমস্যা নেই। ওলা-উবেরের মত টোটো বা টুকটুকের অ্যাপ আছে। আগে থেকে

অর্থাৎ রাস্তার ডানদিক ঘেঁষে গাড়ি চলে। নমপেন শহরটা যেটুকু দেখেছি মোটামুটি পরিচ্ছন্নই লেগেছে। লোকজনের আর্থিক অবস্থা খুব যে উঁচু তা নয় অনেকটা আমাদের মতোই। তবে রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। লোকে খুব নোংরা করে না আর সরকারিভাবেও পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রয়েছে। রাস্তায় আমাদের মতোই ছোট ছোট দোকান আছে, কিছু কিছু বড় বড় শপিংমলও আছে। শহরে চেঁচামেচি খুব শুনিনি। ভোট ছিল, কিন্তু কিছুই বন্ধ হতেও দেখিনি বা শহরের জীবনযাত্রার ওপর কোন প্রভাব পড়তেও দেখিনি।
এখানে রাশিয়ান মার্কেট নামে সেন্ট্রাল মার্কেটের মত একটা বাজার আছে। দোকানপাটের নাম কিছু আমাদের মতো ইংরাজি এবং কিছু কাম্বোডিয়ার খমের ভাষায় লেখা। আর একটা জিনিস দেখলাম, এখানে ফরাসি প্রভাব খুব রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ফরাসি অধিকৃত ছিল। তাই খাওয়াদাওয়া থেকে রাস্তাঘাট, স্থাপত্য সব কিছুর ওপরই ফরাসি ধরণ বজায় আছে। পরদিন রওনা দিলাম নমপেন এয়ারপোর্টের থেকে কলকাতার দিকে। সঙ্গে রইল ভালো এবং মন্দলাগা একরাশ স্মৃতি।

~ সমাপ্ত ~

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক-আধিকারিক মলয় সরকার বর্তমানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষভাবে যুক্ত। এছাড়া পড়াশোনা ও লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। নেশা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ এবং উদ্যানচর্চা।

Comments

Name

Enter your comment here

ছুটির আড্ডা

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

বাসাই দুর্গে একবেলা

সৌম্য প্রতীক মুখোপাধ্যায়

দেশের করোনা ক্যাপিটাল মুম্বাইয়ে তখন রাস্তায় বেরোলে সব লোককেই সন্দেহ হয়, এ বুঝি করোনা রোগী! ওদিকে করোনাকালে বন্দিদশায় মন প্রাণ উড়ু উড়ু। কিন্তু কোথায় যাব? কোন হোটেলে রাত্রিবাস? এইসব ভাবলেই কিছুক্ষণ পরেই ভাইরাসের ভয় গ্রাস করে ফেলছে। আশপাশের সব জায়গায় অনেকবার গিয়ে গিয়ে – আর যাওয়ার তাগিদও পাই না। শেষমেষ খুঁজে পেলাম কাছের এক জায়গা, যেখানে আগে কখন যাওয়া হয়নি।

মুম্বাই শহরের উত্তরপ্রান্তে বাসাই জনবসতি। মুম্বাই থেকে গুজরাত যাওয়ার রাস্তায় হাইওয়ে চলে গিয়েছে বাসাই ছুঁয়ে। একটা বড় গাড়ি ভাড়া করে, সেটিকে আপাদমস্তক পরিষ্কার করে দুই বন্ধুতে মিলে বেরিয়ে পড়লাম এক সকালে – পরিবারদের সঙ্গে নিয়ে। খাওয়াদাওয়া আবার বাইরে করা মুশকিল। তাই টিফিনবাক্স, যেগুলো চার-পাঁচ মাস অনাদরে পড়েছিল, এবার দরকারে লাগল। টিফিনবাক্স ভরে ঘি ভাত থেকে লুচি, আলুর দম থেকে মিষ্টি নিয়ে যাত্রা শুরু হল।

ঠানে ছাড়িয়ে যখন বাসাই ক্রিক পেরোলাম বেলা প্রায় এগারোটা। বাসাই ক্রিক মুম্বাইয়ের উত্তর সীমা। সেখান থেকে যাব আরও তিরিশ কিলোমিটার। প্রথম ভাগটা হাইওয়ে – মসৃণ, আট লেনের; গাড়ির গতি কখনোই আশির নিচে নামবে না। শেষভাগটি প্রায় পনের কিলোমিটার জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে দিয়ে। উপায় ছিল না; লোকাল ট্রেন বন্ধ। নতুবা লোকাল ট্রেনে যাওয়াই সবথেকে সোজা এবং সময়ও সাশ্রয় হয় প্রচুর। পশ্চিম রেলওয়ে আপনাকে ভিরারগামী কোনও লোকালে চাপিয়ে বাসাই নিয়ে যাবে। জ্যামজটের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাবেন সে বলাই বাহুল্য।

যাবো বাসাই দুর্গে। রেল রাস্তা পেরিয়ে আরও ৬-৭ কিলোমিটারের ধাক্কা। বাসাই শহরটি আর পাঁচটি শহরের মতন, কেবল মাঝেসাঝে দু-একটা চার্চ বা একটু অন্য ধাঁচের, ইউরোপীয় গন্ধমাখা বাড়ি চোখে পড়ে। দুর্গটি যেখানে, শহর সেখানে ফিকে হয়ে এসেছে। মাঠঘাট দেখা যেতে শুরু করেছে। ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে আমরা এক বটতলায় থামলাম।

দুর্গ বললেই মনে ভেসে ওঠে দুর্গম এক স্থান - পাহাড়ের ওপরে, উঁচু পাঁচিল ঘেরা। বাসাই দুর্গ সেদিক থেকে আপনাকে হতাশ করবে। উপকূলবর্তী সমতলে, এমনকি সমুদ্রও দেখা যায় না আজ আশেপাশে, দাঁড়িয়ে আছে দুর্গ। বটগাছ, তার পাশের রাস্তার ওপাশে একটা পুকুর, সামনে বজ্রেশ্বরী মন্দির, সব মিলিয়ে এক ঝটকায় যেন বাংলার এক মফঃস্বলে পৌঁছে গেলাম।

বটগাছের পূর্বপ্রান্তে দুর্গের বাইরের অংশ। দেহাতি ভাষায় খন্দহর বিশেষ। সামনেই বিশাল এক ভগ্নপ্রায় স্থাপত্য, দেখে মনে হয়, চার্চ। সামনের পিছনের দেওয়ালগুলি বর্তমান; ওপরের ছাদ গেছে উড়ে। পিছনে আরও কতকগুলি ঘরের মতন, কোনোটারই ছাদ নেই। ভাঙাচোরা কাঠামোটা কোনোমতে দাঁড়িয়ে। হয়তো বসতবাড়ি নতুবা অফিসঘর ছিল এগুলি। সেই ভগ্নাবশেষের মধ্যে বসে – একটা "ঘর" দখল করে – খাওয়াদাওয়া সারা হল; অনেক জার্নি করে পেটের ভিতর থেকে খিদের বার্তা আসছিল।

মূল দুর্গটি প্রায় ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের – নানান রকমের গাছ, বিশেষ করে খেজুরগাছে ভরা। মাঝে একটি জলাশয়, আর চারিদিকে প্রায় ২০ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ওপরে দুজন মানুষ হেঁটে যেতে পারে, সেইরকম পরিসরের রাস্তা। পাঁচিলের গায়ে ছোট ছোট জানালা বিশেষ। নজরদারির জন্যে। দুর্গের চারপাশ গাছগাছালিতে ভরা। একটা গ্রাম্যভাব রয়ে

এই দুর্গে কোনও কামান নেই। নেই কোনও উঁচু মহল, বা প্রাসাদ। ভাঙাচোরা যা আছে, তা দেখে মনে হয় মামুলি কিছু বাড়ি ঘর, কাজের তাগিদে বানানো। রসদ নিয়ে দোর বন্ধ করে দুর্গটিকে কতদিন হানাদারের হাত থেকে বাঁচানো যেত, তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে! দু-একটি পুরানো কুয়ো আছে, আর আছে চড়ুইভাতি করার উপযুক্ত সবুজে বিছানো একটি মাঠ। মনের আনন্দে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখলাম একদল ছেলেমেয়েকে। দুর্গ থেকে সমুদ্র দেখা যায় না, কিন্তু পরে দেখলাম যে সেখান থেকে মিনিট দশেক পা চালিয়ে হাঁটলেই বাসাই ক্রিকের জেটি। তাই মনে হয় অতীতকালে দুর্গের ব্যাপ্তি সমুদ্রের কিনার পর্যন্ত ছিল। জেটি বলুন বা বন্দর, সেটি বাসাই ক্রিক আর মূল সাগরের মিলনস্থলে - ভাঁটার সময়েও বেশ গভীর। আশেপাশে কিছু মন্দির-দরগা; বন্দরে নোঙর করা কয়েকটা মাছ ধরার নৌকা। আর ক্রিকের ওপারে মুম্বাইয়ের স্কাইলাইন।

লোকে বলল, আরও পশ্চিমে এক খাঁড়ির মধ্যে আছে পাচু বন্দর – সেখানে জেলেদের দাপাদাপি। মাছের বাজার। করোনার ভয়ে যাওয়া হল না।

সমুদ্রসৈকতের খোঁজে গিয়েছিলাম সুরুচি বিচে। মুম্বাইয়ের আশেপাশের কোনও সমুদ্রে স্নান করা উচিত নয়ই, আর ধূসরিত আকাশে সূর্যাস্তও মনোরম নয়। একেবারে সাদামাটা জায়গা, না গেলে কোন ক্ষতি নাই। লাভের মধ্যে হল কচি চালকুমড়ো আর শসা কেনা, বেশ সস্তাই।

নটেগাছটি মুড়ানোর আগে একটু ইতিহাসের কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাসাই বয়সে মুম্বাই থেকে পুরোনো। পশ্চিম উপকুলের পর্তুগিজদের যে বাড়বাড়ন্ত ছিল, বাসাই তারই অঙ্গ। ছত্রপতির মারাঠা সাম্রাজ্যের বাইরে এর অবস্থান। বরং গুজরাটের সঙ্গে যোগ যেন বেশি ছিল। শেষমেশ বাসাই পেশওয়াদের দখলে যায় এবং সেখান থেকে ইংরাজের হাতে। বিখ্যাত বাসাই চুক্তির শর্তানুযায়ী মারাঠারা এই সমগ্র এলাকা, মুম্বাইসমেত, ব্রিটিশের হাতে সমর্পণ করে। ক্রমশ বাসাই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে – মুম্বাইয়ের জৌলুসে ফিকে হয়ে পড়ে। আর্কিওলজিকাল সোসাইটির বদান্যতাই যা কিছু বাঁচিয়ে রেখেছে।

জন্ম বসিরহাটে ; পড়াশুনো কলকাতায় – আরও ভাল করে বলতে গেলে উত্তর কলকাতায়। কর্মজীবন মহারাষ্ট্রে। মুম্বাইয়ের উপকণ্ঠে বাস। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়া স্বভাব। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ; কাজের সূত্রে এখানে সেখানে যাওয়া – আর তার মধ্যেও

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

অরিন্দম পাত্র

"তারে আমি চোখে দেখিনি, তার অনেক গল্প শুনেছি গল্প শুনে তারে আমি অল্প অল্প ভালবেসেছি!"

অল্প না, ভীষণ ভাবে ভালবাসি তাকে, মানে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। কিন্তু তখনো অবধি আমার এই মধ্যবিত্ত পাহাড়িয়া ভ্রমণের স্বল্প অভিজ্ঞতায় তার দেখা পাইনি। ইতিপূর্বে মে মাসের শেষদিকের কাঠফাটা গরমে দার্জিলিং আর রিশপ-লোলেগাঁও থেকে চেষ্টা চালিয়েছিলাম তাকে এক ঝলক দেখার। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হতে হয়েছে।
পরিকল্পনা বদলে গত বছর এপ্রিলে ছেলের স্কুল কামাই করিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম সিল্ক রুট। যদি তার দেখা পাওয়া যায়! কিন্তু ইচ্ছেগাঁও-এ ভোরবেলা ধোঁয়াশার মত একবার দেখা দিয়েই উধাও হয়ে গিয়েছিল।
এবছর এসেছি গ্যাংটক-লাচুং-পেলিং টুরে। এবার আর ছেলের স্কুল কামাই করাতে সাহস হয়নি। তাই গরমের ছুটিতেই এলাম।
কিন্তু আসা অবধি বৃষ্টি ছিনেজোঁকের মত পিছনে পড়ে আছে! বিরক্তির একশেষ অবস্থা! গ্যাংটককে দুদিন ভুগিয়ে বন্ধ হল শেষমেষ।
লাচুং ঘুরে পেলিং এলাম। আবহাওয়া আপাত মনোরম, কিন্তু মেঘলা! তার দেখা নেই... আশাও ছেড়ে দিয়েছি। লোকাল সাইটসিয়িং করে পরের দিন নিউ জলপাইগুড়ি ফিরে যাওয়া।
ব্যাগপত্র প্যাকিং করলাম। রাতের খাওয়া সেরে ঘুমোতে গেলাম। আবার ভোরে উঠতে হবে। আট দিনের বেড়ানোর ধকল তো নেহাত কম না!
তারিখটা পরের দিন ছিল ৩/৬/১৮...চিরকাল মনে রাখার দিন! ভোর সাড়ে চারটেয় দরজায় ঠক ঠক! বিরক্তির সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল, কে রে বাবা? বেড টি তো সকাল ছটায় আসার কথা! দরজা খুলে দেখি আমাদের ট্যুর অপারেটর তারকবাবু একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে। "কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে.." বলেই দৌড়লেন পাশের ঘরগুলোর দিকে!

আমি তখন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে! ঠিক শুনলাম তো? কোনমতে পা টেনে পাশের লবির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে স্থাণুর মত হয়ে গেলাম! চোখে জল চলে এল... অবশেষে তিনি দেখা দিয়েছেন! ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে জানাতে একছুটে ঘরে গিয়ে ক্যামেরা আর লেন্স নিয়ে দৌড়ে চলে এলাম ডাইনিং হলের বারান্দায়। সহযাত্রী তাপসদাও তখন সেখানে চলে এসেছেন।

সেই অপরূপ দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগ করতে থাকলাম। সে যেন এক অলৌকিক ব্যাপার! ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টাচ্ছে আকাশের আর তার ছটা পড়ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই অপূর্ব রঙের খেলা দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে গেলাম!

যে ছবিগুলি তুলেছি আসল দৃশ্য তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে আসতেই হল ইচ্ছে না থাকলেও!
ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে আসার আগে শেষবারের মত তার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। বেলা বেড়েছে তখন আর সেও আস্তে আস্তে মেঘের অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে!
কথা দিলাম আবার ফিরে আসব তাকে দেখতে, ফিরে আসতেই হবে।

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্রের নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher